তাওহীদের ডাক

মে-জুন ২০১১

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সালাফী আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে এর ভূমিকা

লিবিয়া

পশ্চিমা থাবায় বিপন্ন আরেক মুসলিম দেশ

ব্রেলভী সম্প্রদায়

উপমহাদেশের একটি ভ্রান্ত ফেরকা

সাক্ষাৎকার

আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ

Contents

The Call to Tawheed

তাওহীদের ডাক

৭ম সংখ্যা
মে-জুন ২০১১

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
নূরুল ইসলাম
নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল : ০১৭৪৪৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www.at-tahreek.com/tawheederdak

মূল্য : ১৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও সোনালী প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

➩ **সম্পাদকীয়** ২
➩ **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
➩ **তানযীম**
সাংগঠনিক মযবুতির উপায় ৫
শেখ রফিকুল ইসলাম
➩ **তারবিয়াত**
ছবরের তাৎপর্য ও কতিপয় দৃষ্টান্ত ১০
ইমামুদ্দীন
➩ **তাজদীদে মিল্লাত**
ব্রেলভী সম্প্রদায় : ভারতীয় উপমহাদেশের এক ভ্রান্ত ফেরকা ১২
মুখতার বিন আযহার
➩ **আহলেহাদীছ আন্দোলন : সুন্নাত দলনের যুগ ও সংকট পরবর্তী যুগে** ১৫
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
➩ **পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে**
সত্যের আলো ১৬
আবু তাহের বর্ধমানী
➩ **সাক্ষাৎকার**
আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ ১৯
➩ **সাময়িক প্রসঙ্গ**
লিবিয়া : পশ্চিমা থাবায় বিপন্ন আরেক মুসলিম দেশ ২২
শেখ আব্দুছ ছামাদ
➩ **বিশেষ নিবন্ধ**
মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় : সালাফী আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে এর ভূমিকা ২৪
মীযানুর রহমান
➩ **পরশ পাথর**
ইয়াহইয়া জোয়ান সুকুইল্যো ॥ শাকিরুল ইসলাম ২৯
ফয়েয মুহাম্মাদ ॥ জাহিদুল ইসলাম ৩১
➩ **তারুণ্যের ভাবনা**
জাতের বড়াই ৩২
শরীফ আবু হায়াত তপু
➩ **ইংরেজী প্রবন্ধ**
I could just live this world Altogether ৩৪
Arif kabir
➩ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়**
বীজগণিতের জনক আল-খাওয়ারযিমী ৩৬
শাহাদত হোসেন
➩ **ভ্রমণ**
নিসর্গের প্রাণোচ্ছলতায়, বৈচিত্রের সমারোহে ॥ আসিফ রেযা ৩৯
পাহাড়ের নেশায় আত্মভোলা একদিন ॥ আব্দুর রাকীব ৪৩
➩ **আলোকপাত** ৪৫
➩ **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৪৬
➩ **কবিতা** ৪৯
➩ **সংগঠন সংবাদ** ৫০
➩ **সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব** ৫২
➩ **সাধারণ জ্ঞান** ৫৩
➩ **সাম্প্রতিক বাংলাদেশ** ৫৫
➩ **সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক** ৫৫
➩ **আইকিউ** ৫৬

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

নাহমাদুহূ ওয়া নুছল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম

গঠনতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ **‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’**-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ২০১১-২০১৩ সেশনের জন্য পুনর্গঠিত হল। ফালিল্লাহিল হাম্দ। ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী এক শুভক্ষণে যে কাফেলাটি হাঁটি হাঁটি পা পা করে অগ্রযাত্রা শুরু করেছিল, দেখতে দেখতে আজ তা ৩৩ বছরে পদার্পণ করল। ইসলামের নামে কিংবা ইসলামের বিরুদ্ধে নামে-বেনামে যখন নানা ভ্রান্ত দল ও মতের প্রবল স্রোত উত্থিত হচ্ছিল এবং তা মানুষের সহজ-সরল ও স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধির উন্মুক্ত গতিপথকে রুদ্ধ করে অসত্যের আবর্জনায় ঢেকে দিচ্ছিল, এমনই ক্রান্তিলগ্নে চলমান স্রোতের বিপরীতে দৃঢ় বাহুবল নিয়ে, সত্য ও ন্যায়ের শ্বেত-শুভ্র নিশানকে বাংলার যমীনে প্রতিষ্ঠার গুরুভার নিয়ে ময়দানে নেমেছিল এই যুব সংগঠন। শিরক ও বিদ‘আতপুষ্ট বাংলার আকাশে তিমিরগাঢ় রাত্রির কুহেলিকা ভেদ করে সেদিন যেন ঊষার শুচিশুদ্ধ আলোকবার্তা নিয়ে আবির্ভাব হয়েছিল এ সংগঠনের। আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘ এই ৩৩ বছরে বহু ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেলেও, বাতিলের পেতে রাখা নানা প্রলোভনের ফাঁদে বিপদগ্রস্ত হলেও ‘যুবসংঘ’ স্বীয় লক্ষ্য ও চলার পথ থেকে একচুল বিচ্যুত হয়নি। বরং বাংলার বুকে এ সংগঠন এমন এক আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে, যার দুঃসাহসী মূলমন্ত্র– ‘আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি’, ‘সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর’। ‘আহলেহাদীছ’ যে ফের্কাবন্দীর আহবায়ক কোন নাম নয়, কোন মাযহাব, মতবাদকেন্দ্রিক গোষ্ঠীর নাম নয়; বরং এ যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের রেখে যাওয়া পবিত্র আমানতকে মানবসমাজে উজ্জীবিত রাখার চিরন্তন আন্দোলন– তা এ সংগঠন প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে বাংলার বহু মানুষ আজ জেনেছে পিতৃপুরুষের আচরিত বিধি-বিধান হলেই তা ইসলাম নয়, পরম শ্রদ্ধেয় মহামানব রচিত গ্রন্থে থাকলেই তা ইসলাম নয়; বরং ইসলাম হল তা-ই, যা তাওহীদ ও রিসালতের অবিনশ্বর দুই খুঁটি, অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত দুই উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পাতায় দেড় হাযার বছর ধরে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

এক্ষণে নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমরা পূর্বসূরী ভাইদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে বাংলার আকাশে-বাতাসে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বার্তা আজ সাবলীলভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। যাদের অকৃত্রিম খুলূছিয়াতের কারণে এ দেশের মানুষ আজ অহি-র বিধানের দিকে, মহাসত্যের দিকে এত নিকটবর্তী হতে পারছে। আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন– আমীন!

এ আন্দোলনের যে সকল কর্মী ভাই আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হক্ব-এর দাওয়াতকে বুলন্দ করার দৃপ্ত শপথ নিয়ে এবং আল্লাহ্র প্রতি স্থির বিশ্বাস রেখে এ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, বাতিলের চোখ রাঙানীকে যারা ঈমানী তেজে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন, আল্লাহ্র রাস্তায় যারা সার্বক্ষণিক মুজাহিদের মত নিজেদেরকে প্রস্তুত রেখেছেন– তাদের প্রতিও আমাদের আন্তরিক ভালবাসা ও শুভকামনা রইল। প্রাণপ্রিয় এসব কর্মী ভাইদের প্রতি আমাদের একান্ত আহবান– আসুন! পথহারা মানুষকে ‘ছিরাতুল মুস্তাকীমে’র পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা নিজেদেরকে আত্মোৎসর্গ করি। যার যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে তার সবটুকু কাজে লাগিয়ে সমাজবিপ্লবের মঞ্চে সাহসী যোদ্ধার মত ঝাঁপিয়ে পড়ি। ইনশাআল্লাহ আমাদের সামষ্টিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ দেশের বুকে একদিন সামগ্রিক পরিবর্তন আসবেই। যে পরিবর্তনে সূচিত হবে তাওহীদভিত্তিক এক পবিত্র সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা; সূচিত হবে রিসালাতভিত্তিক এক সুশৃংখল জীবনব্যবস্থা; তৈরী হবে আখিরাতভিত্তিক এক সুস্থ-সুন্দর মানবসমাজ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুন– আমীন!

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ

আল-কুরআনুল কারীম :

١– وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ–

‘তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল সর্বদাই থাকা প্রয়োজন যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হবে সফলকাম’ *(আলে ইমরান ১০৪)*।

٢– كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ –

‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের জন্য তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে’ *(আলে ইমরান ১১০)*।

٣– لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ كَانُوْا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ–

‘বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের উপর লা‘নত করা হয়েছিল দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে; এ লা‘নত এ কারণে করা হয়েছিল যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করেছিল। তারা যে মন্দ ও গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা পরস্পরকে নিষেধ করত না; বাস্তবিকই তাদের কাজ ছিল অত্যন্ত গর্হিত’ *(মায়েদাহ ৭৮-৭৯)*।

٤– وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ –

‘এবং বলুন! সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক আর যার ইচ্ছা অমান্য করুক’ *(ইউনুস ১০৯)*।

٥– خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ–

‘আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহিলদের কাছ থেকে দূরে সরে থাক’ *(আ‘রাফ ১৯৯)*।

٦– وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ–

‘আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা কল্যাণের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা‘আলা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’ *(তওবা ৭১)*।

٧– التَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْآمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ–

‘তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকূ ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদানকারী ও মন্দকাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহর দেয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে *(তওবা ১১২)*।

٩– إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ–

‘নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ’ *(নাহল ৯০)*।

١٠– الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ–

‘তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত’ *(হজ্জ ৪১)*।

١١– يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ-

‘হে বৎস, ছালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ কর এবং বিপদ-আপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ *(লোকমান ১৭)*।

হাদীছে নববী থেকে :

١٢– عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ- رواهُ الترمذيُّ

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। নতুবা অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা‘আলা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দো‘আ করবে কিন্তু তোমাদের দো‘আ কবুল করা হবে না’ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০, সনদ হাসান)*।

١٣–عَنْ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّكُمْ مَفْتُوْحٌ عَلَيْكُمْ مَنْصُوْرُوْنَ وَمُصِيْبُوْنَ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلْيَنْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ "- رواهُ أَبُو داودَ

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয় তোমাদেরকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) সাহায্য করা হবে, তোমরা (শত্রুদের) অনেক সম্পদ লাভ করবে এবং তোমাদের জন্য (বহু শহর ও দেশ) বিজিত হবে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ সে সময়টি পাবে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। মানুষকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে’ *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৯৩০, সনদ ছহীহ)*।

١٤– عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمُكَ فِىْ وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِىْ أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ- رواهُ الترمذيُّ

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমার ভাইয়ের প্রতি তোমার মুচকি হাস্যমুখ করাও ছাদাকাস্বরূপ, কাউকে সৎকাজের উপদেশ দেয়াটাও একটা দান, অসৎকাজ থেকে

নিষেধ করাও একটা দান এবং পথ হারানোর মত স্থানে কাউকে পথ দেখানোও একটা দান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯১১,সনদ ছহীহ)*।

১৫- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ" - رواهُ مسلمٌ

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন অন্যায় কাজ হতে দেখে, সে যেন তা স্বহস্তে পরিবর্তন করে দেয়, যদি সে ক্ষমতা না থাকে তবে মুখ দ্বারা তার প্রতিবাদ করবে, আর যদি সে ক্ষমতাও না থাকে তবে নিজের অন্তরে তাকে ঘৃণা করবে। আর এটাই হল ঈমানের দুর্বলতম স্তর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/ ৫১৩৭)*।

১৬- عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِمًا فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ- رواهُ الترمذيُّ

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় মানুষ যখন কোন যালিম ব্যক্তিকে দেখে, অতঃপর তারা তার হাতকে যুলুম থেকে বিরত না রাখে, হয়তবা অচিরেই আল্লাহ আমভাবে তাদের সকলের উপর শাস্তি চাপিয়ে দিতে পারেন' *(তিরমিযী হা/১৯৫৬, সনদ ছহীহ)*।

১৭- عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ. قَالُوْا : لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : لِلّٰهِ وَلِكِتَابِه وَلِنَبِيِّه وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلِعَامَّتِهِمْ. رواهُ مسلمٌ

রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'নছীহত করাই দ্বীন'। তিনবার একথা বলার পর ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, কার জন্য হে রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৬)*।

১৮- عَنْ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِيْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإِنْ يَتْرُكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا- رواهُ البخاريُّ

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে মহান আল্লাহ্‌র সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে সীমালংঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদলের মতো, যারা লটারীর মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল উপরতলায়, কেউ নীচতলায়। নীচতলার লোকেরা পানি সংগ্রহকালে উপরতলার লোকদের ডিঙ্গিয়ে যেত। তখন নীচতলার লোকেরা বলল, উপরতলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নিই (তাহলে ভাল হতো)। এমতাবস্থায় উপরতলাবাসীরা যদি এদেরকে আপন মর্জির উপর ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের হাত ধরে রাখে (বিরত রাখে) তবে তারা এবং সকলেই রক্ষা পাবে' *(বুখারী হা/২৪০৩)*।

১৯- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ- رواهُ أَبُو داودَ والترمذيُّ

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অত্যাচারী, যালেম শাসকের সম্মুখে হক্ব কথা বলাই হল উত্তম জিহাদ' *(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৭০৫, সনদ ছহীহ)*।

২০- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِيْ اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. متفقٌ عليه

উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে এ মর্মে বায়'আত করেছিলাম যে, আমরা আমীরের আদেশ শুনব ও মেনে চলব....যেখানেই থাকি সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করব না' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৬)*।

বিদ্বানদের কথা :

১. সুফিয়ান ছাওরী (রঃ) বলেন, সৎকাজের নির্দেশ এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার কাজটি যথার্থভাবে পালন করতে পারে না তিন শ্রেণীর লোক ব্যতীত; এক- সে ব্যক্তি যে সৎকাজের নির্দেশদানে সহনশীল থাকে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধেও সহনশীল থাকে, দুই- সে ব্যক্তি যে এ দু'টি দায়িত্বপালনে ন্যায়বিচারকের ভূমিকায় থাকে, তিন- সে ব্যক্তি যে আদেশ এবং নিষেধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে' *(আল-খাল্লাল, আল আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার, পৃ: ৪৬)*।

২.উম্মুদ দারদা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে সদুপদেশ দেয় গোপনে; সে যেন তাকে সম্মানিত করল, আর যে ব্যক্তি কাউকে ভুল ধরিয়ে দেয় জনসম্মুখে; সে যেন তাকে অপমানিত করল *(ঐ, পৃ: ৪৯)*।

৩.জনৈক আলেম তার সন্তানকে লক্ষ্য করে বলেন, যদি কেউ সৎকাজের উপদেশ দিতে আগ্রহী হয়, তার উচিৎ হবে স্বীয় অন্তরকে ছবরে অভ্যস্ত করা এবং আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদান প্রাপ্তির দৃঢ়বিশ্বাস থাকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, সে বিপদ বা কষ্টের অনুভূতি থেকে মুক্ত থাকে। আল্লাহ তাকে যালিমদের আরোপিত অধিকাংশ বিপদ থেকে রক্ষা করেন- তাদের ইখলাছ, সদিচ্ছা, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের প্রতিজ্ঞার বরকতে *(ইবনুন নুহাস, তানবীহুল গাফিলীন, পৃ:৪৩)*।

৪.সুফিয়ান ছাওরী বলেন, তুমি যখন মানুষকে সৎকাজের উপদেশ দাও তখন মু'মিনের পীঠ শক্তিশালী হয়, আর যখন তুমি মন্দ, অকল্যাণকর কাজ থেকে নিষেধ কর তখন মুনাফিকের নাক যেন ধূলামলিন হয়ে যায় *(আল-খাল্লাল, আল আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার, পৃ: ৪৬)*।

সারবস্তু

১. সৎকাজের নির্দেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা মানুষের ঈমানের পূর্ণতার পরিচায়ক।

২. এ দু'টি বিষয় ব্যক্তি ও সমাজ তথা মানবজীবনের নিরাপত্তা এবং সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

৩. মানবজাতির মাঝে কল্যাণ ও পরিশুদ্ধির অনুভূতি জীবিত থাকে এ দু'টি নীতির মাধ্যমে ।

৪. শিষ্টাচার, সদাচরণের চর্চা বৃদ্ধি এবং মন্দ ও অন্যায় আচরণের নিবৃত্তি- এ দু'টি বিষয় ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমেই সম্ভব।

৫. বিবেকের সুস্থতা ও আত্মার পবিত্রতা অর্জনের জন্য এ দুই নীতি অবলম্বন অত্যাবশ্যক।

৬. মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক হল এ চিরন্তন নীতিদ্বয়- যা আল্লাহ কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

সর্বোপরি পৃথিবীর সকল আইনের উর্ধ্বে নিজস্ব নৈতিকতার প্রহরা সৃষ্টি করা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করা- এ নীতিদ্বয় অবলম্বনকারীর জন্য অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়।

সাংগঠনিক মযবুতির উপায়

-শেখ রফীকুল ইসলাম

ইসলাম আল্লাহ তা'আলা মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসাবে মানুষ তাঁরই বিধান মানবে এটাই স্বাভাবিক। মানুষকে ইসলামী বিধান ব্যতীত অন্য কোন মতাদর্শ গ্রহণ করার কোন প্রকার সুযোগ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দেননি। কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদ গ্রহণ করে তাহলে তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيْناً فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ– 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

আল্লাহ্র বিধান আপনা-আপনি কায়েম হয় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় প্রচার ও আন্দোলনের। আর আন্দোলন একাকী করা যায় না। প্রয়োজন হয় সংঘবদ্ধ জনসমষ্টির। আর সংগঠিত জনগণকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় সংগঠনের। মেরুদণ্ডবিহীন প্রাণী যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তেমনি সংগঠন ছাড়া কোন আন্দোলন, কোন লক্ষ্য বাস্তবায়ন কখনই সম্ভব হতে পারে না।

সাধারণ অর্থে সংগঠন বলতে এমন একদল জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা কোন বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে একত্রিত হয়ে সুশৃংখলভাবে কাজ করে। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাস করতে ভালবাসে। শুধু মানুষ কেন? প্রাণীজগতের অন্য সকল জীব-জন্তুর মধ্যেই সাংগঠনিক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। কুরআন ও হাদীছে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা সম্পর্কে জোর তাকীদ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً وَلاَ تَفَرَّقُوْا – 'আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না *(আলে ইমরান ১০৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ– 'আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়' *(ছফ ৪)*।

প্রখ্যাত ছাহাবী হারিছ আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ : بِالْجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلا أَنْ يُرَاجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ؟ قَالَ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, যে বিষয়ে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হতে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন হল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে ও ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, مَنْ سَرَّهُ بُحْبُحَةُ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ 'যে ব্যক্তি জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করতে চায় তার কর্তব্য হচ্ছে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬০০৩, সনদ হাসান)*। ছাহাবী আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ..فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ 'তোমার উচিৎ হচ্ছে জামা'আতভুক্ত থাকা। কেননা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ভেড়াকেই নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে' *(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/১০৬৮)*।

উপরোক্ত আয়াত, হাদীছসমূহ জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপনের অপরিহার্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। এমনকি নেতার কোন আচরণ অপছন্দনীয় হলেও জামা'আত থেকে পৃথক হওয়া যাবে না। বরং ধৈর্য ধারণ পূর্বক জামা'আতভুক্ত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْراً فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً 'যখন কেউ তার আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কোন আচরণ দেখবে তখন সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ পৃথক হয়ে মৃত্যুবরণ করে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*।

দুর্বল মানুষ দিয়ে যেমন বড় কিছু আশা করা যায় না। তেমনি দুর্বল সংগঠন দিয়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাছিল করা সম্ভব নয়। সেজন্য প্রয়োজন সাংগঠনিক মযবুতি। সাংগঠনিক মযবুতির কিছু উপায় নিম্নে আলোচনা করা হলো।

যোগ্য নেতা নির্বাচন :

যোগ্য নেতা নির্বাচন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংগঠনের নেতা হন একজন নির্বাচিত ব্যক্তি। একজন ব্যক্তি যতই যোগ্যতাসম্পন্ন হোন না কেন, তিনি নিজেই নিজকে নেতা ঘোষণা দিয়ে অন্যদের আনুগত্য দাবী করবেন, ইসলামী বিধি-বিধানে এরূপ কোন নিয়ম নেই। ইসলামে নেতৃত্ব চাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ 'আল্লাহ্র শপথ! আমরা এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করব না, যে তা পাওয়ার জন্য প্রার্থী হবে। অথবা এমন কাউকেও নয়, যে তা পাওয়ার জন্য লালায়িত হবে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৩)*। নেতৃত্ব চেয়ে নিলে তাতে কোন কল্যাণ নেই। বরং না চাইতেই যদি তা অর্পিত হয়, তাহলে তাতে আল্লাহ্র রহমত ও বরকত বিদ্যমান। আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার কারণে তা প্রাপ্ত হলে তোমার

উপরে তা চাপিয়ে দেয়া হবে। আর নেতৃত্ব না চেয়ে পরিবর্তে প্রাপ্ত হলে তুমি তাতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮০)*।

নেতা নির্বাচনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় যাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে নেতা নির্বাচিত হয়, তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আম জনসাধারণের দ্বারা যোগ্য নেতা নির্বাচন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন সৎ, যোগ্য, নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ, দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ নির্বাচকের। কোন অসৎ, অযোগ্য, স্বার্থান্ধ, অদূরদর্শী ও অনভিজ্ঞ নির্বাচকের দ্বারা যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা নির্বাচন করা আদৌও সম্ভব নয়। যোগ্য নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচকের মতামত একটি পবিত্র আমানত। সেজন্য যোগ্যতম ব্যক্তিকে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করা হলে আমানতদারির মূল দাবী পূরণ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহ তার হকদারের হাতে অর্পণ করার আদেশ দিয়েছেন...' *(নিসা ৫৮)*।

ইসলামী বিধানে জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাসের যেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, তেমনি নেতা শূন্য জামা'আতও ইসলামী বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এক কথায় সর্বাবস্থায় যেকোন ধরনের জামা'আত অথবা সংগঠন বা দলের একজন যোগ্য নেতা থাকবেন, এটাই ইসলামী নিয়ম। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُوْنُوْنَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ 'তিনজন লোকের জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা, বৈধ নয়, তাদের মধ্যে থেকে একজনকে আমীর নিযুক্ত করা ব্যতীত' *(আহমাদ হা/৬৬৪৭, সনদ হাসান)*। ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ 'যখন তিনজন একত্রে সফরে বের হবে, তখন তাদের মধ্যে একজনকে তারা যেন আমীর নিযুক্ত করে নেয়' *(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৩৯১১)*।

অযোগ্য ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন না করা :

যোগ্য নেতা নির্বাচন করা যেমন ইসলামী শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তদ্রূপ অযোগ্য ব্যক্তিকে নেতা হিসাবে নির্বাচিত করা আমানতের খিয়ানত করার শামিল। সেজন্য নেতা নির্বাচনের সময় নির্বাচকদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই অযোগ্য ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করা না হয়। ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ : إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ 'যখন আমানত বিনষ্ট হতে দেখবে তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কীভাবে আমানত বিনষ্ট করা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যখন কোন দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হবে তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৪৩৯)*।

নেতার আনুগত্য করা :

নেতার আনুগত্য ছাড়া সংগঠন শক্তিশালী হয় না। যে জামা'আত তার নেতার প্রতি যতবেশী অনুগত, সে জামা'আত তত বেশী মযবুত ও শক্তিশালী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً– 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং তোমাদের মধ্যে থেকে উলুল আমরগণের। অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের পরস্পরে মতবিরোধ দেখা দিলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যার্পন কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক' *(নিসা ৫৯)*। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্ত বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। কোন অবস্থাতেই বা কোন অজুহাতে তার খিলাফ করা যাবে না।

নেতা যদি পরামর্শের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং সে সিদ্ধান্ত যদি আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে নেতার সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) তাকীদ প্রদান করে বলেন, مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِى فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِى فَقَدْ عَصَانِيْ 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করল। যে ব্যক্তি আমীরের (নেতা) আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬১)*।

নেতা যদি নাফরমানির নির্দেশ ব্যতীত কোন নির্দেশ প্রদান করেন এবং সে নির্দেশ যদি সংগঠন বা জামা'আতের কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে অপসন্দ হয়, তথাপিও নেতার সে নির্দেশ মান্য করতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মাতকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ 'প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে নেতার নির্দেশ শুনা ও মানা, চাই সে নির্দেশ তার পসন্দ হোক বা অপসন্দ হোক। যদি তা নাফরমানির নির্দেশ না হয়। আর নাফরমানির নির্দেশ দিলে তা শুনা ও মানা যাবে না' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৩)*। আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ 'গুনাহের কাজে আনুগত্য করা যাবে না; বরং আনুগত্য শুধুমাত্র ন্যায়সংগত কাজে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৫)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯২)*।

নেতার উত্তম আচরণ ও ব্যবহার :

নেতা ও কর্মীদের মাঝে সুসম্পর্ক সংগঠনকে সুসংহত করে। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে সংগঠনের অগ্রগতি তরান্বিত হয়। নেতার আচরণ ও ব্যবহার অতি উত্তম হওয়াই দরকার। নেতার রূঢ় আচরণে কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। নেতাকে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ– 'অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয়ের হয়েছেন এবং আপনি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার সংসর্গ ত্যাগ করত' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

নেতার কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর কথা ও কাজ এমন পর্যায়ের হবে না যা তাঁর কর্মের পরিপন্থী। ফলশ্রুতিতে এমন একটা সময় উপনীত হয়, যখন কর্মীরা তাঁর সমালোচনা করতে দ্বিধা করে না বা তাঁর সম্মুখে উচিৎ কথা বলে

ফেলে। তখন উভয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং সংগঠনে ফাটল ধরে। এজন্য আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত ঘোষণার দিকে সকলের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। -يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ- كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহ্‌র নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক' *(ছফ ২,৩)*।

সংগঠনে নেতার ব্যবহারের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁর ব্যবহারে কর্মীরা যেন কোন অবস্থাতেই কষ্ট না পায় সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলের (ছাঃ) নিম্নের বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, اَللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সামষ্টিক কাজের কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তাদেরকে কষ্টে ফেলে তবে তুমি তাকে কষ্টে ফেলো। আর সে যদি তাদের প্রতি নম্রতা অবলম্বন করে তাহলে তুমিও তার প্রতি নম্রতা অবলম্বন কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৯)*।

আওফ বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ، وَتَدْعُوْنَ لَهُمْ وَيَدْعُوْنَ لَكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ، وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ 'তোমাদের উত্তম নেতা তো তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাস, তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে। তোমরা তাদের জন্য দো'আ কর, তারাও তোমাদের জন্য দো'আ করে। তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা তো তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর, তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দেও, তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭০)*।

আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ 'তোমরা নেতার আদেশ শ্রবণ কর এবং তা পালন কর, যদিও নেতা হাবশী গোলাম হন যার মাথা কিশমিশের ন্যায়' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৬৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে- إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا 'যদি নাক-কান কাটা কৃষ্ণকালো দাসও তোমাদের নেতা নিযুক্ত হন, যিনি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তোমাদেরকে পরিচালনা করেন তাহলে তোমরা তার কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬২)*।

ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً '**আমি** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তার জন্য কোন দলীল থাকবে না। যে ব্যক্তি তার গর্দানে আমীরের আনুগত্যের বায়'আত ব্যতীত মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৪)*।

পরামর্শভিত্তিক কাজ করা :

সংগঠনের অগ্রগতি ও মযবুতির জন্য পরামর্শভিত্তিক কাজ করার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। নেতা তাঁর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে কাজ করবেন এটাই ইসলামের মৌলিক নীতি। সংগঠনের সকল স্তরের কর্মীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নেতার পক্ষে আদৌও সম্ভব নয়। তাই কর্মীদের মাঝ থেকে সংগঠন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে মজলিসে শূরা গঠন করবেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করে নেতা কাজ করবেন। মজলিসে শূরার সদস্যগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে সামনে রেখে খোলা মনে সংগঠনের অগ্রগতি ও মযবুতির স্বার্থে সুচিন্তিত যুক্তিপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করবেন। কারো মুখের দিকে তাকিয়ে বা কারো স্বার্থ রক্ষার জন্য বা কেউ অসন্তুষ্ট হবেন এ চিন্তায় বা ভয়ে মতামত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকা শূরা সদস্যদের কোন অবস্থাতেই উচিৎ নয়। মতামত প্রদানে দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিকে শূরা সদস্য মনোনীত করা ঠিক নয়। তাতে সংগঠনের অগ্রগতি ও মযবুতী তো দূরের কথা বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই প্রবল। নিজ মতামত অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিনির্ভর অভিমতকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য প্রত্যেক শূরা সদস্যকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সকলের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলে অবশ্যই সংগঠনের অগ্রগতি ও মযবুতী বৃদ্ধি পাবে। মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শক্রমে কাজ করায় নেতার স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ থাকে না। শরী'আতে যেসব বিষয়ের স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান তা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শভিত্তিক কাজ করার গুরুত্ব অত্যধিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ- 'আপনার কর্মকাণ্ডে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

পবিত্র আল-কুরআনে মুমিনদের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ- 'যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, ছালাত কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে' *(শূরা ৩৮)*।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَكْثَرَ اسْتِشَارَةً لِلرِّجَالِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আমি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিনি, যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপেক্ষা বেশী পরামর্শ করতেন' *(শারহুস সুন্নাহ ১/৮৪৯ পৃঃ)*। আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ) বলেন, لاَ خِلاَفَةَ إِلاَّ عَنْ مَشُوْرَةٍ 'পরামর্শ ব্যতীত খিলাফত চলে না' *(নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/৭১৫৪, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৩৮১৯৭)*।

খলীফা হিসাবে বায়'আত গ্রহণ বিষয়ে ওমর (রাঃ)-এর বক্তব্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِيْ بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ ছাড়া কাউকে খলীফা হিসাবে বায়'আত করল, তার বায়'আত সিদ্ধ হবে না। সে এবং তার হাতে বায়'আতকারী উভয়ে নিজেদেরকে কতলের শিকার বানিয়ে নিল' *(বুখারী হা/৬৮৩০)*।

নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী :

সংগঠনের মযবুতী ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী। যারা হবে নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা-বিশ্বাসের অধিকারী। আল্লাহ ও রাসূলের উপর পূর্ণ ঈমান রেখে হক গ্রহণে যাদের অন্তরে থাকবে না কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তারা পালন করবে শরী'আত অনুমোদিত সৎকর্মসমূহ। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণে

থাকবে অবিচল। পরিণামে পাওয়া যাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত ও সফলতা। তারা হবে না কখনও ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْعَصْرِ- إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ- إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ- 'মহাকালের কসম! নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে। পরস্পরে হক্ব গ্রহণ করেছে ও পরস্পরে ধৈর্য ধারণ করেছে' *(আছর ১-৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা দুর্বল হয়ো না ও বিষণ্ণ হয়ো না এবং তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ১৩৯)*। প্রতিটি কাজই হতে সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ইবনুল কাইয়িম বলেন, العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه ইখলাছবিহীন কাজ হল ঐ পথিকের মত, যে পথিক তার পানির জগে বালু ভর্তি করে। সে ওটা বহন করে ঠিকই, কিন্তু তা থেকে কোন উপকার পায় না *(আল-ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ৪৭)*।

সংগঠন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা :

সকল পর্যায়ের কর্মীদের সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। লক্ষ্য সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধির ঘাটতি কর্মীকে সংগঠন থেকে নিমিষেই ছিটকে দিতে পারে। তাই বিশেষ করে সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার। সংগঠনের কর্মীদের মনে কোন প্রকার সংশয় থাকলে সংগঠনের অগ্রগতি হবে বাধাগ্রস্ত এবং ফাটল ধরবে সাংগঠনিক মযবুতিতে। তাই লক্ষ্যের প্রতি আস্থা ও বিশ্বস্ততা থাকতে হবে এমনই অবিচল- 'বলুন! নিশ্চয় আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ কেবলই বিশ্বচরাচরের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই' *(আন'আম ১৬২)*। 'বলুন! এটাই আমার পথ, আমি আহ্বান করি আল্লাহ্‌র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আমি এবং আমার অনুসারীবৃন্দ; আল্লাহ শিরক থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১০৮)*। ইবনুল কাইয়িম বলেন, الغاية أول في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العقل، منتهى في منازل الوصول 'লক্ষ্য হল মর্যাদা ও গুরুত্বে সর্বপ্রথম এবং টিকে থাকার জন্য চূড়ান্ত অবলম্বন আর জ্ঞান-বুদ্ধির মূলমন্ত্র এবং গন্তব্যে পৌঁছনোর অন্তীম কেন্দ্র' *(আল ফাওয়ায়েদ, পৃ:৪৭)*।

যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন :

কর্মীদের সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট করা, আস্থাশীল রাখা ও সর্বদা সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত রাখার সবচেয়ে বড় পন্থা হল দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে ইসলামী শরী'আত অনুমোদিত যুগোপযোগী কর্মপন্থা প্রদান করা। ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের অধঃস্তন কর্মীদের সম্পর্কে সর্বদা খোঁজ-খবর রাখা একান্ত প্রয়োজন। কোন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হলে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা দরকার। দায়িত্বশীলদের সাংগঠনিক সফর, সার্বক্ষণিক যোগাযোগ এবং সকলের মানোন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাহলে একে অপরের সাথে সৃষ্টি হবে সুদৃঢ় বন্ধন এবং বৃদ্ধি পাবে সাংগঠনিক মযবুতী।

দায়িত্বশীলদের যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন :

সাংগঠনিক মযবুতী ও অগ্রগতির জন্য দায়িত্বশীলদের যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করা একান্ত যরূরী। যোগ্য কর্মীকে বাদ দিয়ে অযোগ্য কর্মীকে দায়িত্বশীল মনোনীত করলে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা সৃষ্টি হবে। নেতৃত্বের প্রতি কর্মীদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা লোপ পাবে। যোগ্য কর্মীদের মাঝে সৃষ্টি হবে হতাশা এবং অযোগ্য কর্মীদের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে অহংবোধ। ফলে কাজের পরিবর্তে হবে শুধু অকাজ। দুর্বল হবে সংগঠন।

দায়িত্বশীলদের যথাযথ মূল্যায়ন ও দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহিতা :

সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী থাকে এবং যোগ্যতার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে ভিন্নতা দেখা যায়। কোন কর্মী বা দায়িত্বশীল সংগঠনের প্রতি আন্তরিক হয়ে কোন কাজ সম্পাদন করলে তার যথাযোগ্য মূল্যায়ন প্রয়োজন। সাথে সাথে প্রত্যেক কর্মী বা দায়িত্বশীলকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। সুচারুভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে এবং প্রত্যেকটি কাজের জবাবদিহিতার জন্য নিজেকে সদা প্রস্তুত রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই অর্পিত দায়িত্বকে ছোট ও অবহেলার চোখে দেখা ঠিক হবে না। সকলকে জবাবদিহিতার তোয়াক্কা না করার মন-মানসিকতা পরিহার করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

ধৈর্য ধারণ :

সংগঠনের সকল পর্যায়ের কর্মী ও দায়িত্বশীলকে সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ছবর বা ধৈর্যকে সফলতার চাবিকাঠি হিসাবে মনে করতে হবে। ছবর ব্যতীত কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। মানুষ যখন অভাব-অনটন ও দুঃখহীন সুখ-শান্তিতে বসবাস করে, তখন তার পাশব প্রবৃত্তি অসৎ ও অন্যায় কাজ করার জন্য জাগ্রত হয়। সে সময় পাশব প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য প্রয়োজন হয় ছবর বা ধৈর্যের। অপর দিকে কঠিন কাজ সম্পাদন করা, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, বালা-মুছীবত প্রভৃতিতে ধৈর্যধারণ করা মুমিনের লক্ষণ। এক কথায় সকল অবস্থায় ছবর বা ধৈর্য অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাহগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহ্‌র পৃথিবী প্রশস্ত। যারা ছবরকারী তারাই অগণিত পুরস্কার পায়' *(যুমার ১০)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ '(মুমিন হল তারা) যারা অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ছবরকারী। তারাই হল সত্যাশ্রয়ী আর তারাই মুত্তাকী' *(বাক্বারাহ ১৭৭)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- 'তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে কখনও তা শেষ হবে না। যারা ছবর করে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদান স্বরূপ যা তারা করত' *(নাহল ৯৬)*।

নিরাশ না হওয়া :

সাংগঠনিক মযবুতী ও অগ্রগতির জন্য বড় বাধা হল কর্মীদের মাঝে নিরাশ হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া। আর হতাশার জন্ম হয় তখন, যখন কেউ আন্দোলনের তড়িৎ ফল পেতে চায়, অন্যদের দুনিয়াবী জৌলুসে প্রতারিত হয় এবং পরস্পরের আমানতে সন্দেহ পোষণ করে। অপর দিকে সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচী

সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকা এবং সংগঠন কি চায়, কেন চায়, কিভাবে চায়, এর পরিণতি কি? এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের অভাব কর্মীদেরকে সাংগঠনিক কাজে নিরাশ করে দেয়। ফলে সংগঠন আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে, যা পরিহার করা সংগঠনের কর্মীদের একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ বলেন وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ- ‘তোমরা হীনবল হয়ো না, হতাশ হয়ো না, তোমরাই তো বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও’ *(আলে ইমরান ১৩৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ ‘তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ জানবেন না তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য ধারণ করেছে? *(আলে ইমরান ১৪২)*।

সাংগঠনিক শৃংখলা বজায় রাখা :

সংগঠনের মযবুতির জন্য সাংগঠনিক শৃংখলা (Chain of Command) বজায় রাখা অত্যন্ত যরূরী। বিশৃংখলভাবে কাজ করলে তাতে ভাল ফল আশা করা যায় না। ঊর্ধ্বঃতন থেকে অধঃস্তন আবার অধঃস্তন থেকে ঊর্ধ্বঃতন সকল ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃংখলার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি কেন্দ্র তার পরবর্তী অধঃস্তন সাংগঠনিক স্তর যেলা/উপযেলা সংগঠনকে বাদ দিয়ে একেবারে নিম্ন স্তরের শাখা সংগঠনকে কোন বিষয়ে নির্দেশনা দেয়, অনুরূপ শাখা সংগঠন তার ঊর্ধ্বঃতন সংগঠন উপযেলা/যেলাকে বাদ দিয়ে সরাসরি কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রাখে, যে বিষয়ে মধ্যবর্তী সংগঠন কোন খবর না রাখে; সেক্ষেত্রে নিয়ম-শৃংখলা (ঈযধরহ ড়ভ ঈড়সসধহফ) বিঘ্নিত হওয়ার কারণে মধ্যবর্তী সংগঠনের সাংগঠনিক অবস্থা দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক। আবার যদি কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল মাঝখানের সংগঠনের দায়িত্বশীলকে কোন কিছু না জানিয়ে একেবারে নিম্নস্তরের দায়িত্বশীলকে সাংগঠনিক বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে ও শাখা পর্যায়ের দায়িত্বশীল মধ্যবর্তী সংগঠনের দায়িত্বশীলকে তোয়াক্কা না করে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে, তাহলে মধ্যবর্তী সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ উভয়ের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। যার ফলাফল একটা সংগঠনের জন্য শুভকর হয় না। এজন্য সাংগঠনিক শৃংখলার (Chain of Command) প্রতি সকলের সুদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। জনৈক মনীষী বলেন, Conduct yourself in this world as if you are here to stay forever; prepare for eternity as if you have to die tomorrow’ অর্থাৎ এই পৃথিবীতে তুমি নিজেকে এমন সুশৃংখলভাবে পরিচালিত কর যেন তুমি এখানে চিরকাল অবস্থান করবে, আর আখিরাতের জন্য এভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ কর যেন তুমি আগামীকালই মৃত্যুবরণ করবে।’

অহংকার বর্জন ও প্রশংসা বিমুখ হওয়া :

সমস্ত অসৎগুণের মধ্যে সবচাইতে বড় অসৎগুণ হচ্ছে অহংকার ও অন্যের প্রশংসা প্রত্যাশী হওয়া *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*। এটা শয়তানী কাজ বৈ অন্য কিছু নয়। অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য *(জাছিয়া ৩৭)*। لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ ‘যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৭)*। মানুষের সকল প্রকার দুর্বলতার মধ্যে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল নিজেকে বড় জ্ঞানী মনে করা। আর এটা যখন কোন মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয়, তখন সে নিজেকে ত্রুটিহীন ও সকল প্রকারের গুণসম্পন্ন মনে করে নিজ দোষ ও দুর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে সে নিজেকে সবদিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় ও ভাল বলে মনে করে। একারণে নিজেই নিজের সংশোধনের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। তারপর আমি সর্বাপেক্ষা ভাল ও যোগ্য এ অনুভূতি পোষণ করায় অন্যরাও তাকে তাই মনে করুক এ আকাংখা তার মনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তখন সে চারিদিক থেকে শুধু শুনতে চায় প্রশংসা আর প্রশংসা। নিজ দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সমালোচনা তার নিকট অসহ্য মনে হয়। সংশোধনের লক্ষ্যে তার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে তাকে কিছু বললে সে ভীষণ গোস্‌সা হয় ও উত্থাপনকারীর প্রতি রাগান্বিত হয় এবং মনে মনে তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে থাকে। দায়িত্বশীল নেতা ও কর্মীদের জন্য যা আদৌও কাম্য নয়।

নেতা-কর্মীদের মাঝে সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখা :

যে সকল কাজ নেতা-কর্মীদের মাঝে সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয় সে সকল কাজ পরিহার করা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীলদের উচিৎ। নেতা ও কর্মীদের মাঝে সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় না থাকলে সাংগঠনিক মযবুতী বিনষ্ট হয়। সংগঠনের অগ্রগতি থমকে যায়। সাংগঠনিক মযবুতির জন্য সংগঠনের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের মাঝে সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ‘মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর যারা সাথী তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে রুদ্রকঠোর এবং পরস্পরের মধ্যে দয়া ও সহানুভূতিশীল’ *(ফাত্‌হ ২৯)*।

নিজকে যোগ্য করে গড়ে তোলা :

সংগঠনের সকল স্তরের কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রত্যেককে সংগঠনের স্বার্থে সবদিক দিয়ে সাধ্যমত যোগ্য করে গড়ে তোলা দরকার। এতে কর্মীরা স্বীয় কর্মে আত্মবিশ্বাস ও সমাজকে পরিচালনার জন্য স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে, ফলে সংগঠনের মযবুতী বৃদ্ধি পায়। যে সকল গুণাবলী অর্জন করলে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা যায়, সেদিকে সর্বদা খেয়াল রাখা প্রয়োজন। দায়িত্ব সচেতনতা বা দায়িত্ব পালনে আন্তরিক ও যত্নবান হওয়া এবং নিজকে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হিসাবে গড়ে তোলা একান্ত কর্তব্য। বেশী বেশী করে সৎ আমল করা ও সকল প্রকার অন্যায় কাজ পরিহার করে চলা যরূরী। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে ধৈর্যসহ হকের উপর অবিচল থাকা এবং সকল প্রকার বাতিলের সাথে আপোষকামী মনোভাব পরিহার করা সকলের জন্য অতীব প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, কোন মহৎ লক্ষ্য অর্জনে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করাই মূল কথা নয়; বরং সংগঠনকে লক্ষ্য অর্জনে গতিশীল করাই মূল কথা। যেমনভাবে বলা হয়ে থাকে, স্বাধীনতা অর্জন সহজ কিন্তু স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা কঠিন। ঠিক তেমনি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা আয়াসসাধ্য নয়, কিন্তু সংগঠনকে স্বীয় লক্ষ্যে অবিচল ও চলমান রাখাই মূল চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জে বিজয়ী হতে গেলে অবশ্যই সংগঠনের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাঠামোকে শক্তিশালী করতে হয়, ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলার উপযোগী করতে হয়। নতুবা সময়ের ব্যবধানে সামান্য আঘাতেই সংগঠন নিমিষেই শক্তিহীন, নির্জীব হয়ে পড়ে। তাই ইসলামী আন্দোলনের যে কোন পর্যায়ের সংগঠককে আপন পরিমণ্ডলকে মযবুত করার জন্য সাধ্যমত প্রয়াস চালাতে হবে। তবেই কাংখিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন-আমীন!!

▪ ***লেখক:*** *সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও সহকারী অধ্যাপক, পাইকগাছা ডিগ্রী কলেজ, খুলনা।*

ছবরের তাৎপর্য ও কতিপয় দৃষ্টান্ত

ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

ধৈর্য মুমিনের শ্রেষ্ঠতম গুণসমূহের মধ্যে একটি। ধৈর্য অর্থ সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, সহ্য বা অপেক্ষা করার ক্ষমতা, ধীরতা, নিস্পৃহতা ও প্রশান্তি। কুরআন ও হাদীছের পরিভাষায় অন্যায় কাজ হতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা, বিপদে-আপদে নিজেকে অটল, সুস্থির রাখাকেই ছবর বলে। সুতরাং সর্বাবস্থায় সংযম অবলম্বন, ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়ে ধীর স্থির থাকা, রিপুকে আয়ত্তে রাখা এবং নফসের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভই হচ্ছে ছবর।

এই ধরিত্রীর মাঝে জীবন চলার পথে অনেক বিপদাপদ, নানান ধরনের সমস্যা এসে জীবন যাত্রাকে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করে। কিন্তু সেসব বাধাকে পদদলিত করে, কষ্টের সাগর পাড়ি দিয়ে, কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েই পৌঁছতে হয় স্বীয় লক্ষ্যস্থানে। কেউ যদি এ সকল সমস্যাকে দুঃসাহসিক মাঝি মাল্লার মত দূরীভূত করতে না পারে, তাহলে তার জীবনাকাশে সোনালী সূর্যের উদায়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। নেমে আসে অন্ধকারের গহীন অমানিশা। ফলশ্রুতিতে তার সকল আশা দূরাশায় রূপান্তরিত হয়। তখনই দৃঢ় মনোবল নিয়ে মহান আল্লাহর উপর আস্থা রেখে ছবরের মাধ্যমে টিকে থাকতে হয়। দিতে ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা। তবেই পাওয়া যায় সফলতা। নিম্নে ধৈর্যের কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হল।

অতীতে বহু নবী ও রাসূল অত্যাচারিত হয়েও স্বীয় দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব হতে সরে দাঁড়াননি। বরং ছবর করে চালিয়ে গেছেন তাঁদের দাওয়াতী মিশন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'বহু নবী এমন ছিলেন, যাঁদের সাথীরা অনেকে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হয়ে তাঁদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহর পথে তারা বিপদাপদের মুখোমুখি হয়েছেন, সেজন্য তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়েননি এবং দমেও যাননি। এরূপ ধৈর্যশীলগণকে আল্লাহ পসন্দ করেন' *(আলে ইমরান ১৪৬)*।

মানবতার মুক্তির অগ্রদূত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ (ছাঃ) তায়েফবাসীকে দাওয়াত দিতে গিয়েও স্বীয় উম্মতের জন্য ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তায়েফে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে সেখানে দশ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু সকলের উত্তর একই 'তুমি আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাও'।

ফলে ভগ্ন হৃদয়ে তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে যখন তিনি পা বাড়ালেন তখন তাঁকে অপমানিত ও কষ্ট দেয়ার জন্য শিশু-কিশোর ও যুবকদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়া হল। ইত্যবসরে পথের দুই পাশে ভিড় জমে গেল। তারা হাততালি, অশ্রাব্য, অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল-মন্দ করতে ও পাথর ছুড়ে আঘাত করতে থাকল। আঘাতের ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরীরে অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি হ'ল। এমনকি রক্তক্ষরণে তাঁর পাদুকাদ্বয় পায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

তায়েফের হতভাগ্য কিশোর ও যুবকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করছিল তখন যায়েদ ইবনু হারেছা (রাঃ) তাঁকে রক্ষার জন্য ঢালের মত কাজ করছিলেন। ফলে তিনিও তাঁর মাথার কয়েকটি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এভাবে অমানবিক যুলুম-নির্যাতনের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পথ চলতে থাকেন। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ও রক্তাক্ত অবস্থায় পথ চলতে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ) খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত একটি আঙ্গুর বাগানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। তিনি বাগানে প্রবেশ করলে শত্রুরা ফিরে যায়।

অল্পক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার ফলে কিছুটা সুস্থতা লাভ করলে নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে দো'আ করলেন। তাঁর এই দো'আ 'দুর্বলদের দো'আ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর দো'আর একটি কথা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তায়েফবাসীর দুর্ব্যবহারে তিনি কতটা ক্ষুব্ধ এবং তারা ঈমান না আনার কারণে কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন।

তিনি দো'আ করেন এভাবে, 'হে আল্লাহ! আমি আপনারই নিকট আমার দুর্বলতা, অপারগতা এবং মানুষের নিকটে আমার কদর না হওয়ার অভিযোগ করছি। হে দয়াময়! আপনিক দুর্বলের প্রভু এবং আমারও প্রভু। আপনি আমাকে কাদের নিকট সোপর্দ করেছেন? এমন কোন অনাত্মীয়ের কাছে কি, যে রূঢ় আচরণ করে? কিংবা শত্রুর নিকটে, যাকে আমার কার্যের মালিক বানিয়েছেন? যদি আপনি আমার উপর রাগান্বিত না হন তবে আমি কোনই পরোয়া করি না, আপনার ক্ষমাই আমার প্রকৃত কাম্য। আমি আপনার মুখমণ্ডলের ঐ জ্যোতির আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদ্বারা অন্ধকার আলোকিত হয়েছে এবং ইহলৌকিক-পারলৌকিক কার্যাবলী সঠিক হয়েছে। আপনি যখন আমার প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করবেন, কিংবা ধমক দিবেন সে অবস্থাতেও আমি আপনারই সন্তুষ্টি কামনা করি। সকল ক্ষমতা ও শক্তি একমাত্র আপনারই এখতিয়ারভুক্ত। আপনার শক্তি ছাড়া কারোই কোন শক্তি নেই'।

এতো কিছুর পরও মহানবী (ছাঃ) ছবর পরিত্যাগ করে বিচলিত হননি। ছহীহ বুখারীতে ঘটনাটি এভাবে এসেছে- মহানবী (ছাঃ) বলেন, দীর্ঘ বিশ্রামের পর এক সময় আমার মনে কিছুটা স্বস্তির সৃষ্টি হয়। সেখানে আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখি যে, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দান করছে। ব্যাপারটি আরও ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে বুঝতে পারি যে, এতে জিবরীল (আঃ) রয়েছেন। তিনি আমাকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই শুনেছেন এবং দেখেছেন। এখন তিনি পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতাগণকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করছেন। আপনি তাদেরকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন'। এরপর পর্বতের ফেরেশতা আমাকে সালাম জানিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনি চাইলে আমি দু'পাহাড় একত্রিত করে এদেরকে পিষে মেরে ফেলি'। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'না, বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন, যারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং অন্য কাউকে তাঁর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করবে না' *(ছহীহ বুখারী ১/৪৫৮ পৃ:, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১২৫-১২৬)*।

মহানবী (ছাঃ) তায়েফবাসীর ধ্বংস কামনা না করে বরং ধৈর্য ধরে তাদের হেদায়াতের অপেক্ষা করছিলেন। পরবর্তীতে তারা ঈমান আনায়ন করে ইসলামের ব্যাপক উপকার সাধন করে। তাদের উর্বর ভূমির শস্য মুসলমানদের অর্থনৈতিক চাকাকে গতিশীল করতে সহায়তা করে।

আবু তালহা (রাঃ)-এর এক ছেলে অসুস্থ হলো। আবু তালহা তখন বাইরে কোথাও গেলেন। সেই সময় ছেলেটি মারা যায়। আবু তালহা

ফিরে এসে ছেলের অবস্থা জানতে চাইলেন। ছেলে ও মা উম্মু সুলাইম (রাঃ) বললেন, সে আগের চেয়ে ভাল আছে। তারপর আবু তালহাকে তিনি রাতের খাবার দিলেন। আবু তালহা খাবার খেলেন, তারপর স্ত্রী সহবাস করলেন। শেষে উম্মু সুলাইম বললেন, ছেলেকে দাফন করুন। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর কাছে এসে আবু তালহা (রাঃ) তাঁকে এই সংবাদ দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) প্রশ্ন করলেন, আজ রাতে তুমি কি স্ত্রী সহবাস করেছ? আবু তালহা বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্! তাদের উভয়কে তুমি বরকত দাও। এরপর উম্মু সুলাইমের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবু তালহার ছেলে ইন্তিকাল করলে বাড়ীর লোকদেরকে তার মাতা উম্মু সুলাইম বললেন যে, তারা যেন ছেলে সম্পর্কে আবু তালহাকে কিছু না বলে। তাকে যা বলার আমি নিজেই বলব। আবু তালহা বাড়ী আসার পর উম্মু সুলাইম তাকে রাতের খাবার দিলেন। তিনি খাবার খেলেন। তারপর উম্মু সুলাইম নিজেকে আগের চেয়ে অধিক সুন্দর করে স্বামীর জন্য সাজালেন। আবু তালহা তার সাথে সহবাস করলেন। উম্মু সুলাইম যখন দেখলেন, আবু তালহা তৃপ্ত হয়েছেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ হয়েছে, তখন তাকে বললেন, হে আবু তালহা! যদি কোন পরিবারকে কোন সম্প্রদায় কিছু ঋণ দেয়, তারপর সেই ঋণ ফেরত চায়, তবে কি তাদের ঋণ ফেরত না দেয়ার অধিকার সেই পরিবার রাখে? আবু তালহা বললেন, না। উম্মু সুলাইম বললেন, তাহলে আল্লাহ্র নিকট আপনার ছেলের জন্য ছওয়াব কামনা করুন! এই কথা শুনে আবু তালহা রেগে গেলেন এবং বললেন, তুমি আগে কিছু বললে না, এমনকি আমি সহবাসও করে ফেললাম, তারপর আমার ছেলের ব্যাপারে খবর দিলে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে সব কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) দো'আ করলেন, তোমাদের উভয়ের রাতে আল্লাহ্ তা'আলা বরকত দিন।

তারপর উম্মু সুলইম (রাঃ) গর্ভবতী হলেন। কোন এক সফরে তিনি (উম্মু সুলাইম) রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলেন। সফর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) মদীনায় সাধারণতঃ রাতে ফিরে আসতেন না। যা হোক তারা যখন মদীনার কাছাকাছি আসলেন, তখন উম্মু সুলাইমের প্রসব যন্ত্রণা শুরু হল। আবু তালহা এজন্য তার কাছে রয়ে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) চলে গেলেন। আবু তালহা বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তুমি জান যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) যখন কোথাও যান এবং কোথাও থেকে ফিরে আসেন, তখন তাঁর সাথে সাথে থাকতে আমার ভাল লাগে। আর এখন যে কারণে আমি এখানে আটকে পড়লাম তা তুমি দেখছ। উম্মু সুলাইম বলতে লাগলেন, হে আবু তালহা! যে ব্যথা আমি অনুভব করছিলাম, এখন তা আর অনুভব করছি না , চলুন যাই। সেখান থেকে আমরা চলে এলাম। মদীনায় আসার পর তার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হল এবং একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল *(বুখারী, হা/৫৪৭০; মুসলিম, হা/২১৪৪।)*

উম্মু সুলাইম ধৈর্য ধরার ফলে মহান আল্লাহ তাদের ঔরসে পূনর্বার পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে তাদের দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দেন। উম্মু সুলাইম নিজ পেটে ধরা সন্তানের লাশ স্বামীর অলক্ষ্যে রেখে বেদনা বিধুর হৃদয়ের শত যন্ত্রনাকে সবরের ভেলায় ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে সফর ফেরত স্বামীর জন্য উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি কী পরিমাণ সবর করেছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ছবরের চরম বাস্তবতার উদাহরণ এর চেয়ে আর কি হতে পারে। অবশ্য মহান আল্লাহ তাকে ছবরের বিনিময়ে তড়িৎ ফলও দিয়েছিলেন।

উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যদি কোন মুসলমানের প্রতি কোন বিপদ আসে, আর সে তায় বলে যা আল্লাহ তা'আলা তাকে বলতে বলেছেন, তথা- إنا لله وانا إليه راجعـــون অর্থাৎ 'আমরা আল্লাহর জন্য এবং আর তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। অতঃপর বলে, اللهم اجرني في مصيبتين واخلف لى خيرا منها الا اخلف الله خيرا منــه 'হে আল্লাহ! তুমি আমার এই বিপদে আমাকে প্রতিফল দাও এবং তা অপেক্ষা উত্তম বিনিময়ে আমাকে ভূষিত কর। তা হলে আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদানে সম্মানিত করেন। উম্মে সালমা বলেন, যখন (আমার স্বামী) আবু সালাম মারা গেলেন, তখন আমি মনে মনে বললাম, কোন মুসলমান আছেন কী যিনি আবু সালমা অপেক্ষা উত্তম হতে পারেন? কেননা আবু সালমার পরিবারই তো প্রথম পরিবার যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হিজরত করে এসেছিল। তবুও আমি তাই বললাম যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতে বলেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আবু সালামার পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে প্রদান করলেন। যিনি আবু সালামা থেকে অনেক উত্তম ব্যক্তি *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৮)।*

সম্মানিত পাঠক! উপরোক্ত ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি কল্যাণ কোথায় কিভাবে নিহিত রয়েছে তা মানুষের (সম্পূর্ণ) জ্ঞানের বাইরে। যা কল্পনাও করার বিষয় না। যার বাস্তব উদাহরণ উম্মু সালামা। যিনি স্বামী হারিয়ে ধৈর্যের বিনিময়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে স্বামী হিসাবে পেয়েছিলেন।

আতা ইবনে আবু রাবাহা বলেন, আমাকে একদা ইবনে আব্বাস বললেন, (আতা) আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মেয়ে লোক দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ ! দেখান। তিনি বললেন, এই কালো মেয়ে লোকটি জান্নাতী। সে একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং উলঙ্গ হয়ে পড়ি। আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য দু'আ করুন। মহানবী (ছাঃ) বললেন, যদি ইচ্ছা কর তাহলে সবর বা ধৈর্য ধরতে পার। আর ধৈর্য ধরলে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি ইচ্ছা কর সুস্থ হওয়ার তাহলে আমি তোমার জন্য দু'আ করব, যেন আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করেন। মহিলাটি বলল, আমি ছবর করব। অতঃপর বলল, তবে আমি যে অসুস্থতার সময় নগ্ন হয়ে যায়। দু'আ করুন আমি যেন নগ্ন না হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দু'আ করলেন সে যেন রোগাক্রান্ত হওয়ার সময় নগ্ন না হয়। ফলে তারপর থেকে তিনি অসুস্থ হলে আর নগ্ন হয়ে যেতেন না। *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৭৭)।*

মহিলাটি যদি সুস্থতার জন্য মহানবী (ছাঃ)-এর জন্য নিকট দু'আ চাইতেন তাহলে হয়তো সুস্থ হয়ে যেতেন, তবে তার জন্য জান্নাত না জাহান্নাম তা বলা কঠিন ছিল। কিন্তু অসুস্থ থেকে ধৈর্য ধরার বিনিময়ে তাকে মহান আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দান করবেন। যা ছবরের বাস্তব ফলাফল হিসাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ছবরের ফলাফল সুখকর জানার জন্যই মহানবী (ছাঃ) মহিলাকে ছবর করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে উক্ত পরামর্শ তার নিকট উপস্থাপন করে ছিলেন। সবর বা ধৈর্য মানুষকে বড়, সম্মানী ও মর্যাদাবান হতে সহায়তা করে থাকে। ধৈর্যহীন মানুষের দ্বারা পৃথিবীতে কোন দিন কোন কঠিন ও মহৎ কাজ সাধিত হয়নি। এই বিশ্ব চরাচরে যত জটিল ও স্মরণীয় বরণীয় মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনর বিনিময়েই সাধিত হয়েছে। স্বয়ং মহানবী (ছাঃ) দ্বীন ইসলামে বিজয়ী মিশন সফল হওয়ার পিছনে রয়েছে কল্পনাতীত ধৈর্যের সফল পরীক্ষা। যদি তিনি এ পরীক্ষায় হেরে যেতেন তাহলে ইসলাম হয়তো অনেক আগেই দুনিয়া থেকে মুছে যেত। তাই একথা বলতেই হয় ধৈর্যের বাস্তবতা তিক্ত হলেও তার ফলাফল পরিশেষে সুমিষ্টই হয়। আল্লাহ আমাদেরকে ধৈর্যশীল বান্দাদের অন্ত র্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

- *লেখক: কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।*

ব্রেলভী সম্প্রদায় : উপমহাদেশের একটি ভ্রান্ত ফেরকা

-মুখতার বিন আযহার

বহু বাতিল ফেরকার জন্মভূমি এই ভারত উপমহাদেশ। বিশেষ করে ছূফীবাদী মরমীবাদী চিন্তাধারার ফেরকাগুলো এখানকার আর্দ্র জলবায়ুতে আর্দ্র জনমানুষের মননে এক উর্বর ক্ষেত্র পেয়েছে। এসব ফেরকাগুলোর মধ্যে যে কয়েকটি মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে উপমহাদেশের মানুষের মধ্যে, তার একটি হল ব্রেলভী মতবাদ। বাংলাদেশে তেমন শোনা না গেলেও পাকিস্তান ও ভারতে ব্রেলভী-দেওবন্দী দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ইতিহাস শতবর্ষের পুরনো। ১৯৯০-২০০০-এর মধ্যে মসজিদ দখল নিয়ে বেশ কয়েকবার তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ২০০১ সালে ব্রেলভী সংগঠন 'সুন্নী তাহরীকে'র নেতা সালীম কাদরী দেওবন্দী সমর্থিত সিপাহ-ই-ছাহাবা নামক একটি গ্রুপের হাতে নিহত হন। ২০০৬ সালে করাচীতে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনকালে ব্রেলভীদের সমাবেশে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে তাদের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাসহ ব্রেলভীদের ৫৭ জন নিহত হয়। ব্রেলভী মতবাদের জন্ম ১৮৮০ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীতে, আহমাদ রেযা খান (১৮৫৬-১৯২১খৃ:)-এর হাতে। হানাফী মতাবলম্বী এবং ছূফীবাদে বিশ্বাসী এই ফেরকাটির জন্মই ঘটেছে উপমহাদেশে সংস্কারপন্থীদের হাত থেকে সনাতন ছূফীবাদী, মরমীবাদী আক্বীদা-আমলকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য। ব্রিটিশ আমলে 'আশেকে রাসূল' নামে এই মতবাদটি সমধিক পরিচিত লাভ করেছিল। অবশ্য দলটির চিন্তাধারা পূর্বসূরী ছূফী নামধারী শিরক ও বিদ'আতী ফেরকাগুলো থেকে ভিন্ন কিছু নয়। নিম্নে এই ভ্রান্ত ফেরকাটির পরিচিতি ও আক্বীদা-আমল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

নামকরণ :

ব্রেলভী মতবাদের অনুসারীদের কাছে এ দলের নাম 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'। নিজেদেরকে তারা সুন্নী ইসলামের অনুসারী প্রমাণ করার জন্য এ নাম ব্যবহার করে। তবে অন্যদের কাছে দলটি 'ব্রেলভী' নামেই সমধিক পরিচিত; এ মতবাদের প্রবর্তক আহমাদ রেযা খানের জন্মভূমি রায়বেরেলীর নামানুসারে। এদের বর্তমান নেতা আন-নাওয়ারীর নামানুসারে এদেরকে জামা'আতে নাওয়ারীও বলা হয়।

দলটির প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় :

এই দলটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযা তাকী আলী খান জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীতে। পিতা নকী আলীর কাছে তিনি প্রচলিত দারসে নিযামী ধারার পাঠ গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৭৭ সালে জনৈক শাহ আলে রাসূলের নিকট কাদেরিয়া তরীক্বার বায়'আত নেন ও খেলাফত লাভ করেন এবং ঐ সালেই পিতার সাথে হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কায় গমন করেন। অতঃপর দেশে ফিরে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন এবং ১৮৮০ সালের দিকে তিনি তার শিরকী মতবাদ প্রচার করা শুরু করেন। তিনি নিজেকে অতিশয় রাসূল প্রেমিক প্রমাণের জন্য নামের পূর্বে 'আব্দুল মুছতফা' (মুহাম্মাদ মুছতফার দাস)' উপনাম ব্যবহার করেন। অনুসারীদের কাছে তিনি 'ইমাম' ও 'আ'লা হযরত' নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন চিররোগা, খিটখিটে মেযাজের পিঠব্যথার রুগী, অত্যধিক রাগী, সুচতুর ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। আরবী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় তার রচিত মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ, কবিতাগ্রন্থ ইত্যাদির সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৯৬০টি বলে কথিত রয়েছে। তবে আল্লামা ইহসান এলাহী যহীর বলেন, বই হিসাবে গণ্য হয় এমন বইয়ের সংখ্যা ১০-এর অধিক নয়। ১৯১২ সালে তার অনূদিত কুরআনের উর্দূ তরজমা 'কুনূযুল ঈমান ফি তরজমাতিল কুরআন' প্রকাশিত হয়। তার প্রধান ও সর্ববৃহৎ রচনা হল 'ফৎওয়া রেযভিয়াহ' যা ২৭ খণ্ডে রচিত ও প্রতিটি খণ্ড ১০০০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট। পরে রেযা ফাউণ্ডেশনের তত্ত্বাবধানে এটি ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯০,০০০। এছাড়া আনবাউল মুছত্বফা, খালিছুল ই'তিক্বাদ, মারজাউল গায়ব ওয়াল মালফূযাত প্রভৃতি তার প্রসিদ্ধ রচনা। তিনি কুরআন-হাদীছের গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ৮ শতাধিক নাম পেয়েছেন বলে দাবী করেছেন এবং আরো ১৪০০ নাম আবিষ্কার করেছেন। তার অধিকাংশ রচনাতেই রাসূল প্রেমের বন্দনা প্রবল আকারে প্রকাশ পেয়েছে। দেওবন্দী ও ওয়াহ্হাবীরা তার ভাষায়– রাসূল (ছাঃ)- কে যথাযথ সম্মান না দেয়ায় তিনি তাদের তীব্র সমালোচনা ও তিরস্কার করেছেন। অন্যদিকে অবশ্য ক্বাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে তিনি জোর তৎপরতা চালান। বৃটিশ ইণ্ডিয়াকে 'দারুল হারব' ঘোষণাতে ছিল তার ঘোর আপত্তি। তাই এ দেশে জিহাদ ও হিজরতের বিরোধিতা করেন তিনি। ১৯২১ সালে ৬৫ বছর বয়সে তিনি মারা যান। রায়রেরেলীতেই তার মাযার রয়েছে।

এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ :

প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ : মুস্তফা রেযা খান, হামিদ রেযা খান, দিদার আলী, নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (১৩০১-১৩৬৫হিঃ) যিনি একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম দেন 'জামেআরা নাঈমিয়াহ', আমজাদ আলী বিন জামালুদ্দীন বিন খোদাবখ্‌শ (১৩২০-১৩৬৮ হিঃ), হাশমত আলী খাঁ; তিনি 'নিজেকে কালবে আহমাদ রেজা খান' নামে অভিহিত করেন, সাইয়েদ সুজাত আলী কাদরী, আহমাদ ইয়ার খান (১৯০৬-১৯৮১হিঃ) প্রমুখ।

বর্তমান নেতৃবৃন্দ : আখতার রেযা খান (ব্রেলভীদের ইণ্ডিয়ান গ্রাণ্ড মুফতী), কামারুয্যামান আযমী, মুহাম্মাদ এমদাদ হোসাইন পীরযাদা, মুহাম্মাদ ইলিয়াস ক্বাদরী (দাওয়াতে ইসলামী'র প্রধান) আমীন মিঞা কাদরী, আহমাদ সাঈদ কাযমী, আবু বকর মুহাম্মাদ (অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জমঈয়তুল ওলামার প্রধান), মুকাররম আহমাদ (ফতেহপুর মসজিদ, দিল্লী), মুজীব আশরাফ প্রমুখ। এছাড়া বর্তমান পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট ইউসুফ রাজা গিলানী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমূদ শাহ কোরেশী, বৃটিশ কনজারভেটিভ পার্টির চেয়ারম্যান ব্যারোনেস সাইয়েদা ওয়ারসী ব্রেলভী মতাবলম্বী বলে পরিচিত।

সংগঠনসমূহ :

পাকিস্তান হল বর্তমানে এই মতবাদপন্থীদের মূল কেন্দ্র। সেখানে তাদের কয়েকটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে। যেমন জমঈয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান, জামাআতে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামী, সুন্নী তাহরীক প্রভৃতি। ইণ্ডিয়াতে মুম্বাইয়ে অবস্থিত রেযা একাডেমী তাদের প্রধান কেন্দ্র। লণ্ডনে তাদের 'বৃটিশ মুসলিম ফোরাম' ও 'ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশন' নামে দু'টি সংগঠন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ইমাম আহমাদ রেযা একাডেমী' নামক একটি দাওয়াতী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া 'দাওয়াতে ইসলামী' এবং 'সুন্নী দাওয়াতে ইসলামী' নামক দু'টি আন্তর্জাতিক দাওয়াতী মিশন তারা পরিচালনা করছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ :

এই মতবাদের অনুসারীরা উপমহাদেশে অনেক খানকা, মাযার ও মাদ্রাসা স্থাপন করেছে। এই মতবাদের প্রবর্তক আহমাদ রেযা খান তার প্রধান কেন্দ্র বেরেলী শহরে 'জামে'আ মানযারে ইসলাম' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মাদরাসায় প্রচলিত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়। উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের নিকট ফৎওয়া চাওয়া হলে এখান থেকেই তারা ফৎওয়া প্রদান করেন।

এই চিন্তাধারার দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র হল মুরাদাবাদ। ১৩২৮ হিজরী সালে মুহাম্মাদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী সেখানে দারুল উলূম নাঈমিয়া নামে একটি দ্বীনী শিক্ষাগারের ভিত্তি স্থাপন করেন। অত্র প্রতিষ্ঠান থেকেই উক্ত চিন্তাধারার বিশিষ্ট আলেম-উলামা শিক্ষালাভ করেছেন। পাকিস্তানে উক্ত চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের মধ্যে লাহোর, 'জামে'আ নাঈমিয়া গাড়হী শাহো' ও দারুল উলূম হিযবুল আহনাফ উল্লেখযোগ্য। করাচীতে মাওলানা আব্দুল হামীদ বাদাউনী প্রতিষ্ঠিত জাম'আ তাবলীগিয়াহ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্র। এছাড়াও লায়ালপুরের মাদরাসা মাযহারুল ইসলাম এবং মুলতানের মাদরাসা আনওয়ারুল ইসলাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এদের উপস্থিতি :

মূলত: ভারত-পাকিস্তানেই এদের সংখ্যাধিক্য। তবে বাংলাদেশ, বার্মা, শ্রীলংকায় এদের অনুসারী সংখ্যা কম নয়। ইউরোপীয় দেশসমূহেও তাদের উপস্থিতি রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, মরিশাস সহ আফ্রিকার কিছু কিছু দেশে তাদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। আর বাংলাদেশের খানকা, মীলাদ, মাযার ও কবরপূজারী অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এই মতবাদপুষ্ট।

ব্রেলভী মতবাদ :

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই দলটি ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী'র আন্দোলন, শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ)-এর বংশধর, বিশেষত শাহ আব্দুল আযীয ও শাহ ইসমাঈল শহীদের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও উলামায়ে দেওবন্দের আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য জন্মলাভ করে। রাসূল (ছাঃ) প্রেমের আতিশয্য প্রকাশ করতে গিয়ে তারা জঘন্য ধরনের বহু শিরকী ও বিদ'আতী আক্বীদা ও আমলের উদ্ভব ঘটিয়েছে। নিম্নে তার কিছু নমুনা দেয়া হল। –

১.তাদের বিশ্বাস হল, রাসূল (ছাঃ) এমন ক্ষমতার অধিকারী, যার মাধ্যমে তিনি সারা দুনিয়া পরিচালনা করে থাকেন। তাদের একজন বড় নেতা আমজাদ আলী ব্রেলভী বলেছেন, 'রাসূল (ছাঃ) হলেন আল্লাহর সরাসরি নায়েব। সমস্ত বিশ্বজগৎ তাঁর পরিচালনার অধীন। তিনি যা খুশী করতে পারেন এবং যাকে খুশী দান করতে পারেন, যাকে খুশী নিঃস্বও করতে পারেন। তাঁর রাজত্বে হস্তক্ষেপ করা দুনিয়ার কারু পক্ষে সম্ভব নয়। যে তাঁকে অধিপতি হিসাবে মনে করে না, সে সুন্নাত অনুসরণের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে'। আহমাদ রেযা খান ভক্তির আতিশয্যে গদগদ চিত্তে লিখেছেন, ' হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আমি আপনাকে আল্লাহ বলতে পারছি না। কিন্তু আল্লাহ ও আপনার মাঝে কোন পার্থক্যও করতে পারছি না। তাই আপনার ব্যাপারটি আমি আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দিলাম, তিনিই আপনার ব্যাপারে সবিশেষ অবগত' *(হাদায়েক বখশিশ, ২/১০৪)*।

২.তাদের মতে, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ওলী-আওলিয়ারাও দুনিয়া পরিচালনার কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। আহমাদ রেযা খান লিখেছেন, ' হে গাওছ (আব্দুল কাদের জিলানী)! 'কুন'-বলার ক্ষমতা লাভ করেছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর প্রভুর কাছ থেকে, আর আপনি লাভ করেছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) থেকে। আপনার কাছ থেকে যা-ই প্রকাশিত হয়েছে তা-ই দুনিয়া পরিচালনায় আপনার ক্ষমতা প্রমাণ করেছে। পর্দার আড়াল থেকে আপনিই আসল কারিগর।'

৩.ব্রেলভীদের বিশ্বাস হল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নূরের তৈরী এবং তিনি হাযির (সর্বত্র উপস্থিত) ও নাযির (সর্বদ্রষ্টা)। আর সেটা এইভাবে যে, বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে তাঁর রূহানিয়াত (আত্মিকশক্তি) ও নূরানিয়াত বিচ্ছুরিত হয়। এই রূহানিয়াত ও নূরানিয়াতের জন্য স্থানের নৈকট্য-দূরত্বের কোনও তারতম্য নেই। কেননা আলমে খালক্ব (সৃষ্টিজগৎ) স্থানকালের গণ্ডিতে আবদ্ধ, কিন্তু আলমে আমর (নির্দেশজগৎ) এই গণ্ডি হতে মুক্ত ও পবিত্র। ফলে যুগপৎভাবে বিভিন্ন স্থানে তাঁর উপস্থিতি এবং প্রকাশ্যভাবে জাগ্রত অবস্থায় তাঁর সাক্ষাত লাভে আওলিয়া কেরামের ধন্য হওয়া সম্ভবপর। কারণ তিনি নূর। আর নূর স্বীয় দৃষ্টি শক্তি দ্বারা নিখিল বিশ্ব দর্শন করতে সক্ষম এবং তাঁর পক্ষে বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব।

৪.তাদের মতে, রাসূল (ছাঃ) হলেন গায়েবজান্তা। এমন কি পঞ্চ-গায়েবের মধ্য হতে নানা শাখাগত জ্ঞান আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন। রূহের হাক্বীক্বাত ও আল-কুরআনের মুতাশাবিহাত সম্পর্কে তিনি জ্ঞান লাভ করেছেন। ভূত-ভবিষ্যতের যতসব ঘটনা লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত হয়েছে এবং এ ছাড়াও অন্যান্য ঘটনা রাসূল (ছাঃ) অবহিত ছিলেন। আহমাদ রেযা খান লিখেছেন, আল্লাহ আমাদের নেতা, আমাদের অভিভাবক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে লওহে মাহফূযের যাবতীয় কিছু দান করেছেন' *(খালেছুল ই'তিক্বাদ, পৃ:৩৩)*।

৫.যেহেতু ব্রেলভীদের মতে, রাসূল (ছাঃ) হাযির-নাযির, আলিমুল গায়েব ও নূর, সেহেতু তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, তাঁকে ডাক দেয়া এবং ইয়া রাসূলাল্লাহ ধ্বনি দেওয়া জায়েয। সাহায্যের জন্য যে ব্যক্তি তাঁকে ডাকে, তিনি তা শ্রবণ করেন এবং তাকে সাহায্য করেন। এজন্য প্রতি ফরয ছালাতের পর তাদের ইমাম ছাহেব সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াত পড়ে 'ইয়া নবী সালামু আলাইকা' বলে কোরাস শুরু করেন এবং মুক্তাদীরা সমস্বরে সেই কোরাসে যোগ দেয়।

৬.তারা মনে করে, এই সাহায্য প্রার্থনার জন্য আহ্বান করা রাসূল (ছাঃ) ছাড়াও আওলিয়া কিরামের ক্ষেত্রেও বৈধ। পবিত্রাত্মাদের জন্য দর্শন ও শ্রবণে দূরত্ব ও নৈকট্য বরাবর। আওলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ্র নূর দ্বারা দেখেন। আর আল্লাহ্র নূরের কোন প্রতিবন্ধক নেই। সুতরাং আওলিয়াদের রূহের কোন পর্দা নাই। সমস্ত জগৎ তাঁদের জন্য একই রকম। আওলিয়াদের কারামাত ও তাঁদের সম্মোহনী শক্তি তাঁদের ইন্তেকালের পরেও যথারীতি বাকী থাকে। মৃত্যুর ফলে তাঁদের উক্ত গুণাবলী বিলীন হয়না। কেননা তারা ইন্তেকাল করেন অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূগর্ভে স্থানান্তরিত হন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন না বা একেবারে শেষ হয়ে যান না। ফলে তাঁদের সাহায্য করার একশভাগ সম্ভাবনা সর্বত্র বিরাজমান থাকে। যা কেবল নিকটতম কিছু লোকের মধ্যে গণ্ডিভূত নয়। অতএব সাহায্য প্রার্থনার জন্য তাঁদের আহ্বান করতে হলে সর্বদা কবরের নিকটে উপস্থিত হওয়ার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। বরং যেখান থেকেই ডাকা হৌক না কেন তা বৈধ। শুধু তাই নয় তারা এও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যেহেতু একা, সেহেতু একাই তার পক্ষে পুরো বিশ্বজগত পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ফলে তিনি তাঁর বিশ্ব পরিচালনা কাজের সুবিধার্থে আরশে মু'আল্লায় একটি পার্লামেন্ট কায়েম করেছেন। সেই পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা মোট ৪৪১ জন। আল্লাহ তাদের স্ব-স্ব কাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তন্মধ্যে নাজীর ৩১৯ জন, নাকীব ৭০ জন, আওতাদ ৭ জন, কুতুব ৫ জন, আবদাল ৪০ জন এবং একজন হলেন গাওছুল আযম যিনি মক্কায়

Contents

থাকেন। উম্মতের মধ্যে আবদাল ৪০ জন আল্লাহ তা'আলার মধ্যস্থতায় পৃথিবীবাসীর বিপদাপদ দূরীভূত করে থাকেন। আর আওলিয়া দ্বারা সৃষ্টজীবের হায়াত, রুযী, বৃষ্টি, বৃক্ষ জন্মান ও মুছীবত বিদূরণের কার্য সম্পাদন করেন। মৃতগণ কবরে শ্রবণ, দর্শন ও উপলব্ধি করে থাকেন। তাদের শ্রবণ ও দর্শন যদিও সব সময় থাকে, কিন্তু জুম'আর দিনে তা বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং সাধারণ মৃত ব্যক্তিরাও কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়া যিয়ারাতকারীদের সাথে কথা বলে।

৭.ব্রেলভীরা শী'আদের মত মনে করে যে, ওলীরা মা'ছূম। তাদের কোন পাপ নেই। তাই শী'আদের ইমামদের মত তারাও তাদের আওলিয়াদের মাযার তৈরী করে। মাযারে মোমবাতি বা আলোকসজ্জা করে, কবরের উপর ফুল, নকশাদার চাদর ইত্যাদি চড়ায়। তাদের কবরকে ঘিরে তাওয়াফ করে। তারা মনে করে, আওলিয়াদের নযর-নেয়ায দেয়া এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা জায়েয। এমনিভাবে জানাযার ছালাতের পর হাত তুলে দো'আ করা, ফাতেহা পাঠ করা, তীজা, চল্লিশা ও বার্ষিক ঈছালে ছাওয়াবের অনুষ্ঠান ও উৎকৃষ্ট ভোজের ব্যবস্থা করত: কুরআন খতম করা, কবরের পার্শ্বে আযান দেওয়া, মৃতের কাফনের উপরে কালেমা তাইয়েবা লেখা, শায়খ আব্দুল কাদির জিলানীর স্বরণে ফাতিহা-ইয়াযদাহমের অনুষ্ঠান করা এবং আওলিয়াদের নামে পশু পালন ইত্যাদি শিরকী-বিদ'আতী কাজকে তারা পরম ছওয়াবের কাজ মনে করে।

৮.তাদের বিশ্বাস, মৃতের নামে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ছাদাকা করলে মৃতের ক্বাযা ছালাত ও ছিয়ামের জন্য তা কাফফারা হয়ে যায়। এজন্য প্রতি ওয়াক্ত ছালাত ও ছিয়ামের জন্য তারা এক ছা ফিৎরা সমমূল্য অর্থ নির্ধারণ করে।

৯.তাদের নিকট সবচেয়ে বড় ঈদ এবং বড় উৎসবের দিন হলো ঈদে মীলাদুন্নবী। এই দিন তারা মহা ধুমধামে জশনে জুলূসের আয়োজন করে এবং বিভিন্ন ভক্তিপূর্ণ গান ও আনন্দ-ফূর্তির আয়োজন করে থাকে। আর রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা কাহিনী বর্ণনার জন্য এদিন তারা তথাকথিত সীরাত মাহফিলের আয়োজন করে।

১০. ওলী-আওলিয়াদের মাযারে কথিত 'ওরস শরীফ' পালন তাদের জন্য বিরাট আনন্দের উপলক্ষ। এ উপলক্ষে তারা বাৎসরিক বিরাট মাহফিলের আয়োজন করে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়। এ দিনটিকে তারা পীরের নেক নযর লাভ ও অত্যন্ত ছওয়াব কামাইয়ের দিন বলে মনে করেন। যারা ছালাত, ছিয়াম আদায় করে না তারা এদিনকে তাদের পরিত্যাগকৃত ছালাত, ছিয়ামের জন্য কাফফারা আদায়ের দিবস বা মুক্তি লাভের দিবস মনে করে।

ব্রেলভীদের মূল আক্বীদার ভিত্তি :

তারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী। কিন্তু তাদের বিশ্বাসের মূল সৌধ নির্মিত হয়েছে মূলত: শী'আ সম্প্রদায় কেন্দ্রিক। ফলে দেখা যায় তাদের আমল-আক্বীদায় শী'আদের মতবাদের ব্যাপক প্রভাব। আর তারা মূলত: তিনটি বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

(১) প্রাচ্য দর্শন ভিত্তিক মাযহাব, যা দক্ষিণ এশীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে এসেছে।

(২) খৃস্টানদের নিকট থেকে আগত মাযহাব, যা হুলূল (حلول) ও ইত্তেহাদ (اتحاد) দু'ভাগে বিভক্ত। হুলূল (حلول) অর্থ 'মানুষের দেহে আল্লাহ্‌র অনুপ্রবেশ'। হিন্দু মতে, নররূপী নারায়ণ।

(৩) ইত্তেহাদ বা ওয়াহাদাতুল উজূদ (وحدة الوجود) বলতে অদ্বৈতবাদী দর্শনকে বুঝায়। যা হুলূল-এর পরবর্তী পরিণতি হিসাবে রূপ লাভ করে। এর অর্থ হল আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া (الفناء في الله)। তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে অস্তিত্ববান সব কিছুই মূলত আল্লাহ্‌রই অংশ। আল্লাহ পৃথক কোন অস্তিত্বের নাম নয়। অস্তিত্ববান সবকিছুতেই তার প্রকাশ নিহিত। এজন্য হিন্দু দার্শনিকগণ ঈশ্বর, মানুষ ও ব্যাঙের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে না পেয়ে বলেন, 'হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়। হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়'। আর মরমীবাদী বাউল, পীর-ফকীররা বলে, আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা; আহমাদ, আহাদ হলে তবে যায় জানা। মীমের ঐ পর্দাটিকে উঠিয়ে দেখরে মন, দেখবি সেথায় বিরাজ করে আহাদ নিরঞ্জন। অর্থাৎ আল্লাহ ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) এক ও অভিন্ন। ফলে এ আক্বীদার ভিত্তিতে আজকাল মসজিদে, বাসে, রিকশায় সর্বত্র 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' পাশাপাশি লেখার ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়।

কুফরী ফৎওয়া প্রদান :

বাতিলপন্থী মুশরিক ব্রেলভীদের নিকট আহলে সুন্নাতের প্রায় সমস্ত আলেম-ই কাফের। বিশেষ করে ইমাম বুখারী থেকে শুরু করে ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী প্রমুখ এবং তাদের অনুসারীগণ তাদের মতে কাফের। উপমহাদেশে ভারতগুরু নামে খ্যাত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী প্রমুখ আহলেহাদীছ আলেম-ওলামাগণ এবং দেওবন্দী আলেম-ওলামাগণ ও তাদের অনুসারীবৃন্দ সকলেই তাদের নিকট কাফের। কেননা তাদের মতে এসব আলেমগণ রাসূল (ছাঃ)- কে যথাযথ সম্মান করেন না।

ব্রেলভী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে লাজনা দায়েমার ফৎওয়া :

এক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ফৎওয়া বোর্ড লাজনা দায়েমা থেকে ফৎওয়া দেয়া হয়েছে, এ ধরনের কুফরী আক্বীদাসম্পন্ন লোকের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না। যদি তারা মূর্খ হয়, তবে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় তাদের পরিত্যাগ করে আহলে সুন্নাতের কোন মসজিদে ছালাত আদায় করতে হবে *(ফৎওয়া নং ৩০৯০, ২/৩৯৪-৩৯৬ পৃ:)*।

পরিশেষে বলা যায়, ব্রেলভী মতবাদ উপমহাদেশে পীর-মাযারী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে শিরক ও বিদ'আতের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে। এই মুশরিক দল ও তাদের বিভ্রান্ত আক্বীদা থেকে নিজেদের হেফাযতে রাখা এবং অন্যদেরকে বিশেষত: সাধারণ মানুষকে এদের খপ্পর থেকে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন!!

তথ্যসূত্র :

(১) আল্লামা ইহসান এলাহী যহীর, আল-ব্রেলভিয়া : আক্বায়েদ ওয়া তারিখ (লাহোর: ইদারাতু তরজুমানিস সুন্নাহ, ১৯৮৪, ৬ষ্ঠ প্রকাশ)।

(২) সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ ১৬ খণ্ড (১ম ভাগ), (ইফাবা : ১৯৯৫) পৃ: ৫৩৬।

(৩) ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রবন্ধ : মা'রেফাতে দ্বীন, মাসিক আত-তাহরীক (২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী'৯৯), পৃ: ৩।

(৪) সম্পাদনা পরিষদ, সম্পাদক : ড মানে' আল জুহানী, আল মাওসূআহ আল-মুয়াসসারাহ ফিল আদয়ান ওয়াল মাযাহেব ওয়াল আহযাব আল মুআছারাহ, প্রকাশক : ওয়ার্ল্ড মুসলিম এসেম্বলী (ওয়ামী)।

▪ ***লেখক:*** *সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী মহানগরী।*

Contents

আহলেহাদীছ আন্দোলন : সুন্নাত দলনের যুগ ও সংকট পরবর্তী যুগে

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারের আন্দোলনই হচ্ছে আহলেহাদীছ আন্দোলন। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে এ আন্দোলন চলে এসেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শক্তি এ আন্দোলনের উপর খড়গহস্ত চালিয়ে এর অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। কিন্তু এটা কখনো থেমে থাকেনি। এ আন্দোলনের আলোকোজ্জ্বল অতীত ও স্বর্ণালী ইতিহাস তারই প্রোজ্জ্বল প্রমাণ। আলোচ্য নিবন্ধে সুন্নাত দলনের যুগে ও সংকট পরবর্তী যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবস্থা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

সুন্নাত দলনের যুগ (১৯৮-২৩২হিঃ) :

১৫০ হিজরীর পরে গ্রীক দর্শন উদ্ভূত যুক্তিবাদের প্ররোচনায় কালামশাস্ত্রবিদ একদল বুদ্ধিজীবীর অভ্যুদয় ঘটে। এসব কালাম শাস্ত্রবিদ ও মু'তাযেলা মতাবলম্বী বুদ্ধিজীবীদের কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সহজ-সরল হাদীছভিত্তিক জীবন পরিচালনায় ব্যত্যয় ঘটে। এ সময় বিদ্বানগণ ইসলামের মূল আক্বীদাগত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে কুটতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এতে বহু মুসলমান আক্বীদাগত বিভ্রান্তি তে পতিত হন। এই যুগের দ্বিতীয় পর্বে (১৯৮-২৩২ হিঃ) আব্বাসীয় খিলাফতকালে আল-মামূন, মু'তাছিম ও ওয়াছিক বিল্লাহ পরপর খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁরা সকলেই মু'তাযিলী মতবাদ গ্রহণ করেন। তারা এ মতবাদের পক্ষে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ফলে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের উপরে নেমে আসে এক মহা পরীক্ষার যুগ। আহলেহাদীছগণের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (১৬৪-২৪১ হিঃ) উপরে নেমে আসে লোমহর্ষক নির্যাতন। তৎকালীন মু'তাযিলা মতাবলম্বী আব্বাসীয় খলীফা আবু ইসহাক ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে 'কুরআন সৃষ্ট' এটা স্বীকার করতে নির্দেশ দিলে তিনি তা অস্বীকার করেন। এ কারণে তাঁকে গ্রেফতার করে চাবুক মেরে রক্তাক্ত হয়। একাধারে তিন তিনজন খলীফার শাসনামলে তাঁর উপরে এই নির্মম নির্যাতন অব্যাহত থাকে। এত নির্যাতনের পরও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তাঁকে ঐ কথা স্বীকার করার জন্য নানা ভয়-ভীতি দেখিয়ে বার বার চাপ প্রয়োগ করা হলেও তিনি তাদের এ অন্যায় দাবীর কাছে নতি স্বীকার করেননি। এভাবে অন্যান্য আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের উপরও নির্যাতন চালানো হয়। সেজন্য এই যুগকে 'সুন্নাত দলনের যুগ' বলা যায়।

সংকট ও সুন্নাত দলন যুগে (১০০-২৩২ হিঃ) তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও অন্যান্য আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ 'প্রচার ও প্রতিরোধ' উভয়বিধ পন্থায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। তারা বিদ'আতী আলেমদের সাথে বিভিন্ন তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ যুগে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মুজাদ্দিদ খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (৯৯-১০১ হিঃ) স্বয়ং এসব বিদ'আত প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। তিনি ক্বাদারিয়া নেতা গায়লান দামেস্কী (নিহত ১০৫ হিঃ)-কে দরবারে ডাকিয়ে এনে তার মতবাদের সপক্ষে দলীল পেশ করতে বলেন। গায়লান সূরা দাহর-এর ৩নং আয়াত পেশ করে। খলীফা তাকে আরও সামনে পড়ে যেতে বলেন। অতঃপর উক্ত সূরার সর্বশেষ দু'টি আয়াত পাঠ অন্তে খলীফা তাকে জিজ্ঞেস করেন, এখন বল তোমাদের বক্তব্য কি? সে লা-জওয়াব হয়ে যায়। অবশেষে উপস্থিত সঙ্গী-সাথীসহ সকলে 'তওবা' করে চলে যায়। কিন্তু খলীফার মৃত্যুর পরে পুনরায় গায়লান তার পূর্ব মতে ফিরে যায়। পরবর্তী খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালেক (১০৫-১২৫ হিঃ) তাকে দরবারে ডাকিয়ে এনে একটি বিতর্কসভার আয়োজন করেন। গায়লান পরাজিত হলে খলীফা তাকে হাত-পা কেটে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেন। পরবর্তীতে তিনি আরেকজন ক্বাদারিয়া নেতাকে দরবারে ডাকিয়ে এনে আহলেহাদীছগণের অন্যতম নেতা ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হিঃ)-এর সঙ্গে বিতর্ক সভা করান। পরাজিত হলে তাকে ও উপরোক্ত ভাগ্য বরণ করতে হয়।

জাহমিয়া মতবাদের প্রবক্তা জাহ্‌ম বিন ছাফওয়ান উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধৃত হয়ে ১২৮ হিজরীতে ইসফাহান অথবা মারভে নিহত হন। অন্যতম জাহমিয়া নেতা জা'আদ বিন দিরহামকে কূফার গভর্ণর খালেদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-কাসারী ১২৪ হিজরীতে ঈদুল আযহার দিন খুৎবার পরে মিম্বরের নিকটে নিজ হাতে যবেহ করেন। জা'আদ এ বিশ্বাস পোষণ করত যে, 'আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-কে খলীল (বন্ধু) রূপে গ্রহণ করেননি' এবং 'মূসা (আঃ)ও আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলেননি'। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এ দু'টি বিষয়কে অস্বীকার করায় তাকে হত্যা করা হয়।

আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের ব্যাপক দাওয়াতী তৎপরতা এবং সাথে সাথে প্রশাসনিক কঠোরতার ফলে এসব বিদ'আতী ফিৎনা উমাইয়া যুগে (৪০-১৩২/৬৬১-৭৫০ খৃঃ) খুব বেশী প্রসার লাভ করতে পারেনি। আব্বাসীয় যুগের (১৩২-৬৫৬/৭৫০-১২৫৮ খৃঃ) প্রথমার্ধে (১৯৮-২৩২ হিঃ) মু'তাযিলা ফিৎনা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খুবই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের উপরে চরম নির্যাতন নেমে আসে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১) এ সময় কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তবুও সকল প্রকার নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করেও হাদীছপন্থী বিদ্বানগণ ছাহাবা যুগের আক্বীদা ও আমলকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টায় সুদৃঢ় থাকেন।

সংকট পরবর্তী যুগ (২৩২-৪র্থ শতাব্দী হিজরী) :

ওয়াছিক বিল্লাহ (২২৭-২৩২ হিঃ)-এর পরে তার ভাই মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ (২৩২-২৪৭ হিঃ) খলীফা নিযুক্ত হলে মু'তাযিলা মতবাদ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা হতে বঞ্চিত হয়। ফলে মু'তাযিলা সংকট দূরীভূত হয় এবং আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণ স্বাধীনভাবে কুরআন-হাদীছের প্রচার-প্রসার, পঠন-পাঠন, সংগ্রহ ও সংকলনের দিকে মনোনিবেশ করেন। তৃতীয় শতাব্দী হিজরী 'হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের স্বর্ণযুগ' হিসাবে পরিগণিত হয়। ছিহাহ সিত্তাহ্‌র মুহাদ্দিছগণ এ যুগেই ইসলামের শ্রেষ্ঠ খিদমত হিসাবে ছহীহ হাদীছ সমূহ যাচাই-বাছাই, সংকলন ও লিপিবদ্ধ করে জনগণের সামনে পেশ করেন। ছিহাহ সিত্তাহ বা কুতুবুস সিত্তাহ সংকলকগণ হ'লেন, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ), মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (২০৪-২৬১ হিঃ) আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী (২০২-২৭৫ হিঃ), আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ), আহমাদ বিন শু'আইব আবু আব্দুর রহমান আন-নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হিঃ), আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী (২০৯-২৭৩ হিঃ)। এছাড়া অসংখ্য খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান এ যুগে মূল্যবান লেখনী পরিচালনা করেন। তাই এ যুগের প্রথমার্ধকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের 'রেনেসাঁ যুগ' বলে অভিহিত করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর যত নির্যাতন এসেছে, এ আন্দোলন তত বেগবান ও গতিশীল হয়েছে। জেল-যুলুম, অত্যাচার-নিপীড়নে এ আন্দোলনের অকুতোভয় বীর সেনানীরা মুষড়ে পড়েননি, দমে যাননি, থেমে যায়নি তাদের গতি। বরং সকল প্রতিবন্ধকতা, যাবতীয় প্রতিকূলতাকে পদদলিত করে তাঁরা সামনে এগিয়ে গেছেন। শত নির্যাতনকে হাসিমুখে বরণ করে তাঁদের মিশনকে অব্যাহত রেখেছেন। আমাদেরকেও তাঁদের মতই বুকে হিম্মত নিয়ে, বাহুতে বল নিয়ে, তেজোদ্দীপ্ত ঈমানী শক্তি নিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে হকের পথের এ দুর্জয় কাফেলা তার লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে পারবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

সত্যের আলো

মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী

*[মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী একজন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেমে দ্বীন। ১৯২১ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান যেলার মঙ্গলকোট থানাধীন শিমুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি সপরিবারে বাংলাদেশে হিজরত করেন এবং দিনাজপুর শহরের পাটুয়াপাড়া মহল্লায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি প্রথম জীবনে কলিকাতা হতে প্রকাশিত 'মাসিক তাওহীদ' (যা পরে মাওলানা আয়নুল বারীর সম্পাদনায় 'আহলে হাদীস নামে প্রকাশিত হয়েছে) ও দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত 'মাসিক আল-মুজাহিদ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কলকাতার 'সাপ্তাহিক পয়গাম' ও 'সাপ্তাহিক মোহাম্মাদী'র সাথে প্রায় এক যুগেরও অধিককাল তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৮৬ সালে তিনি সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ১৯৯৭ সালে অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ২০০১ সালের ২১শে মার্চ ৮০ বছর বয়সে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন (লেখকের বিস্তারিত জীবনী জানার জন্য মাসিক আত-তাহরীক মে ২০০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ছোটবেলা থেকেই তাঁর লেখালেখির অভ্যাস ছিল। ১৩৬৪ সালে (১৯৫৮ খৃ:) তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা **'সত্যের আলো'**র বিরুদ্ধে মামলা হয় আদালতে এবং মামলা চার বছর চলার পর অবশেষে পুস্তিকাটি বাযেয়াফ্ত করা হয়। তখন উভয়বঙ্গে পুস্তিকাটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর মাধ্যমে তিনি মুসলমানদেরকে তাদের অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। মুসলমানদের মৃতপ্রায় ঈমানী চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁর লেখনীতে শংকিত হয়েছিল ভারত সরকার। নিম্নে বহুল আলোচিত সেই পুস্তিকাটি থেকে নির্বাচিত কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠকদের খেদমতে হুবহু পত্রস্থ করা হল।- নির্বাহী সম্পাদক]*

হে মুছলিম জেগে ওঠো

অমর কবি আল্লামা ইকবাল মুছলমানদের লক্ষ্য করে বলেছেন :

ছবক্ পড় ফের ছাদাকাত কা
আদালাত কা শাজাআত্ কা
কাম লিয়া জায়েগা তুঝ্সে
দুনিয়া কি ইমামত কা ॥

হে মুছলিম তুমি আবার সত্যবাদিতার, ন্যায়পরায়ণতার ও শৌর্য-বীর্যের ছবক পড়। তোমার দ্বারা তাহলে দুনিয়ার নেতৃত্বের কাজ নেওয়া হবে।

সত্যি কথা, মুছলমান যদি মিথ্যা, শঠতা ও প্রতারণাকে পরিহার করে সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে তাহলে নেতৃত্বমণ্ডিত আসন আবার ফিরে পেতে পারবে। তারাই আবার খিলাফতে ইলাহিয়ার সুমহান আসনে উপবেশন করবে। কিন্তু মুছলমান আজ ভুলে গেছে তাদের ইতিহাসকে, ভুলে গেছে তাদের ঐতিহ্যকে, ভুলে গেছে তাদের তাহজীব ও তামাদ্দুনকে। যাঁর বাহিনী মদিনা থেকে মার্চ করে পৃথিবীর এক বৃহত্তম অংশকে জয় করে নিয়েছিল এবং যিনি সে যুগের খ্রীষ্টান ও রোমক সম্রাটদের যাবতীয় গর্ব ও অহংকারকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন- মুসলমানগণ ভুলেছে আজ সেই মহাপুরুষ ফারুকে আযম ওমরের কথা। তারা ভুলে গেছে আজ আমীর হামজা ও খালেদ বিন ওলিদের শৌর্য বীর্যের কথা, তারা ভুলে গেছে আজ তাদের জাতীয় আদর্শকে।

তাই বলি, হে মুছলিম! তুমি যে সিংহ শাবক, তুমি যে, বীরের বাচ্চা। তোমার আজ এ দুর্দশা কেন? কতদিন তুমি অন্য জাতির বলির পাঁঠা হয়ে থাকবে? হে মুসলিম, উঠ, জাগো। জলদ গম্ভীর স্বরে তুমি হেঁকে বল- আমি মুসলিম। আমি আল্লাহ্‌র জন্য সব কিছু দিতে পারি।

হে মুছলিম– তোমার আজ চতুর্দিকে শত্রু। তলওয়ারের দ্বারা, গোলাগুলির দ্বারা ও লেখনীর দ্বারা তোমার জাতীয় গৌরবের উজ্জ্বল প্রদীপকে নিভিয়ে দিবার জন্য চতুর্দিকে আজ ষড়যন্ত্র চলছে। তোমার সন্তান-সন্ততির মন ও মস্তিষ্কে ঈমানিয়াতের কোন ছোঁয়া যাতে না লাগতে পার তজ্জন্য পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ ও আল্লার রাছুলের নামটা পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। তোমার ছেলে কলেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসে বলছে, আল্লাহ নাই, নামাজ আবার কি? রোজা আবার কি? হজ্জ করে কি হবে? হে মুসলিম, তুমি ভেবে দেখো তোমার উন্নতি কোথায়? এখনও যদি তুমি সতর্ক না হও তাহলে গজবে এলাহির কঠোর ধাক্কায় তোমার অস্তিত্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তুমি স্মরণ কর সেই আল্লামা শহীদ ইসমাঈলের কথা- যিনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য বালাকোটের রণাঙ্গনে নিজের তপ্ত কলিজার রাঙ্গা খুন ঢেলে দিয়ে ত্যাগের মহান আদর্শ রেখে গেছেন। স্মরণ কর তুমি মোজাদ্দেদে আলফে ছানী, সৈয়দ আহমাদ সিরহিন্দীর কথা, স্মরণ কর তুমি খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর কথা, মখদুম আব্দুল্লাহ গজনবী ও মখদুম আব্দুল্লাহ গুজরাটির কথা; যাঁরা দীনের জন্য, সত্যের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

হে মুছলিম! তোমাকে আজ শহীদ ঈসমাঈলের মত, শাহ অলিউল্লাহর মত, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর মত, মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর মত, মখদুম আব্দুল্লাহ গজনবী ও আব্দুল্লাহ গুজরাটির মত হবে হবে।

হে মুছলিম, তুমি দলাদলি ভুলে যাও। সংহতির বিধ্বস্তিই তোমাকে এত পশ্চাতে রেখেছে। যারা নাস্তিক, যারা আল্লাহকে মানে না, যারা বহু ঈশ্বরবাদী, যারা নদী-নালা, খাল-বিল, খড়-কুটা, কাদা-মাটি সব কিছুরই পূজা করে, যারা ঈমানের স্বাদ কেমন তা জানে না, তারা সকলেই উন্নত হয়ে যাচ্ছে। চির অভিশপ্ত ইহুদী আজ রাজশক্তির অধিকারী। আর তুমিই কেবল পশ্চাতে পড়ে রইলে! হে মুছলিম তুমি যে বড় শক্তির অধিকারী তা কি তুমি ভুলে গেলে? তোমার কাছে যে সব থেকে বড় অস্ত্র আছে, সে আজ হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ।" 'লা' যে তোমার বড় অস্ত্র। 'লা'-এর দ্বারা তুমি সব ইলাহকে, সব শক্তিকে মিছমার করে দিয়ে ইল্লাল্লাহ, আল্লাহকে বাকী রেখেছ। তুমি যে আল্লাহর দাস। তবে কেন আজ প্রবৃত্তির মোহে, গদীর মোহে, চাকরীর মোহে, রূপের মোহে, অট্টালিকার মোহে, নারীর মোহে, ভূসম্পদের মোহে তোমার জাতীয় গৌরবকে হারিয়ে ফেলছ? হে মুছলিম, আজ ভায়ে ভায়ে মিলে যাও। কবির ভাষায়-

মুখেতে কালেমা অন্তর তলে
আকদুল মাওয়াখাত্
পদতলে যত পর্বতগিরি
হয়ে যাক্ ধূলিস্মাৎ।

ইংরেজ জাতি একতার বলেই একদিন পৃথিবীর বুকে তাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে সমর্থ হয়েছিল। ভারতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পাঠানেরা যখন ইংরেজী মহিলা মিসেস এলিসকে অপহরণ করেছিল তখন মুষ্টিমেয় ইংরেজ ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। ছোট্ট একটি বাচ্চার পর্যন্ত রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হে মুসলিম, তোমার মধ্যে সে ভ্রাতৃত্ব নাই। তোমার এক ভাই যদি কষ্ট পায় তাহলে তুমি মুচকি হাসো। কত মুসলিম রমণীর যে ইজ্জত বর্বর অমুসলিমরা নষ্ট করে

দিয়েছে তা কি তুমি জানো না? কিন্তু ইংরেজের মত তোমার প্রাণে কি ব্যথা লেগেছিল? তাই বলি হে মুসলিম, অতীতের ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা লাভ কর। জেগে উঠ, জেগে উঠ। *(অর্ধ সাপ্তাহিক পয়গামে ৮ম বর্ষ ৬৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত)।*

আবার তোমরা জাগো

হে মুছলিম-তুমি জেগে উঠো। বেহুঁশ হয়ে, গাফেল হয়ে তুমি তোমার কীর্তিমানকে আর হারিও না। তোমার রাজ্য গেছে, সম্পদ গেছে, কিন্তু তোমার ইতিহাসকে কে তো কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার স্বাতন্ত্র্য ও তোমার ঈমানকে তো কেউ অপহরণ করে নিতে পারেনি। হে মুসলিম যাদের ঈমান আছে, যাদের ইতিহাস আছে, তাদের সবই আছে। ইতিহাসই তোমাকে প্ররণা জোগাবে। তুমি জাগো। যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মিথ্যা বিরুদ্ধে, ছলনার বিরুদ্ধে, প্রতারণার বিরুদ্ধে, কুসংস্কারে বিরুদ্ধে, মিথ্যার প্রহসনের বিরুদ্ধে, কালোবাজারীর বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারে বিরুদ্ধে, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে, বর্বরতার বিরুদ্ধে তুমি সংগ্রাম চালাও। দুর্বলতাকে তুমি পরিহার কর। তুমি ভীরু হয়ো না, কাপুরুষ হয়ো না, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ো না।

তুমি জাগো। ওমর (রাঃ)-এর মত ত্যাগ নিয়ে, খালেদ বিন ওলিদের (রাঃ) মত বীরত্ব নিয়ে, আমির হামজার (রাঃ) মত হিম্মত নিয়ে, ইমাম হোসায়েন (রাঃ)-এর মত শৌর্য-বীর্য নিয়ে তুমি জাগো। যার নিষ্কাসিত তরবারী ও ক্ষুরধার লেখনী উনবিংশ শতকের অন্ধকারের মাঝে জাগরণের বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল সেই গাজী আল্লামা ইসমাঈল শহীদের মত তুমি জাগো।

হে মুছলিম! তোমার শিক্ষা ও সভ্যতার কাছে সারা দুনিয়া ঋণী। বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগের মানত তোমার সভ্যতার কাছে মাথা নত করেছে। জাবেরের মত, আল-ফাজারীর মত, আল-খারেজমীর মত, আল-হাছিব, আল-কারাজী ও আল-খাইয়ামের মত অঙ্কশাস্ত্রের মহাপণ্ডিতদের অভ্যুদয় তোমার মাঝেই ঘটেছিল। হে মুসলিম- তোমার মাঝে আবু মাশা, মাশা আল্লাহ, মোহাম্মদ আলভেন্দী, মোহম্মদ ইবনে ইবরাহীম, ইবনে মুছা, ইয়াকুব ইবনে তরিক, ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ও আলী ইবনে ইউনুছের মত জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কারকগণ আর্বিভাব হয়েছিল। পদার্থ বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতম আল-হাছানের আর্বিভাব তোমারই মাঝে ঘটেছিল।

হে মুছলিম! রসায়ন শাস্ত্রের স্থপতি তুমি । তোমার মাঝে রসায়ন বিজ্ঞানের জন্মদাতা আবু মুছা জাবের ইবনে হাইয়ানের অভ্যুদয় ঘটেছিল। আর্সেনিক, অ্যান্টমনি, নাইট্রিক, এসিড, সিলভার নাইট্রিক, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, মারকিউরিক ক্লোরাইড, মারকিউরিক অক্সাইড, লিভার অফ্ সালফার ভিট্রিয়ল অ্যালাম, আলমাররী, সাল আমনিক, সল্টপিটার, লীড এসিটেড প্রভৃতি আবিষ্কার করে আবু মুছা রসায়ন শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন।

হে মুছলিম! চিকিৎসা বিজ্ঞানে তোমার অবদান অফুরন্ত। অস্ত্রোপচারের যে পদ্ধতি তুমি আবিষ্কার করেছ, সর্বযুগের সভ্য মানুষ তার কাছে ঋণী থাকবে। হে মুছলিম! স্থাপত্য শিল্পের সাধনায় তুমি জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছ। আগ্রার তাজমহল, জেরুজালেমের ওমরের মসজিদ, কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলের সেন্টসফিয়া মসজিদ, দিল্লীর কুতুর মিনার, স্পেনের আল-হামরা ও কর্ডোভার মসজিদ তোমার সাধনাকে সাফল্যদান করে দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

হে মুছলিম! নারীর অধিকার তুমি দিয়েছে। মানবত্বের দিক দিয়ে, মানুষ্যত্বের দিক দিয়ে নারী যে পুরুষের উর্ধে উঠতে পারে একথা তুমিই বলেছ। চৌদ্দশত বছর পূর্বে তুমি বলেছ কন্যা পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে। তুমি বিধবাকে পুনর্বিবাহের অধিকার দিয়েছ।

হে মুছলিম! তুমি উঠ, জাগো। তোমার লুপ্ত শক্তিকে আবার ফিরিয়ে আনো। যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, যে প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, অল্প সংখ্যক মুছলিম সারা বিশ্বের মাঝে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হযেছিল সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে , তোমার অতীত শক্তিকে আবার ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।

হে মুছলিম! তুমি তো দুর্বল নও। তোমার মাঝে দেখতে পাই হামজার মত, ওমররে মত, আলীর মত, তারিকের মত, ইমাম হোসায়েনের মত, মুহাম্মদ বিন কাসিমের মত, আল্লাম ইসমাইলের মত বীর যোদ্ধাদেরকে। তোমার মাঝে দেখেছি একদিন হাসান বছরীর মত, জোনায়েদ বাগদাদীর মত, আব্দুল কাদের জিলানীর মত, শাহ অলিউল্লার মত, আবিল হাওয়ারীর মত, শেখ ইবরাহীমের মত, বায়োজীদ বোস্তামীর মত, আব্দুল্লাহ গজনবীর মত, শাহ জাকেরের মত, যিননুন মিছরীর মত মহা সাধকদেরকে। হে মুছলিম মাতা ও ভগ্নিগণ- তোমরা জাগো ফাতেমার মত, আয়েশার মত, রাবেয়া বছরীর মত তোমরা জাগো।

হে মুছলিম তুমি জেনে রেখো, "ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালাকে বাদ।" আসুক আবার চেঙ্গিস, আসুক হালাকু, আসুক ফেরাউন ও শাদ্দাদ, আসুক মিরজাফর ও উমিচাঁদ, তুমি ভীত হয়ো না, তুমি দিশেহার হয়ো না।

হে মুছলিম তুমি জেনে রেখো, ফেরাউনের স্বৈরাচারের কাছে হযরত মুসা মাথা নত করেননি, দোর্দণ্ড প্রতাপ সম্রাট নমরুদের অনাচারের কাছে ইবরাহীম নত হননি। লালসা সর্বস্ব এজিদের খেলাফতির কাছে ইমাম হোসায়েন দুর্বলতা প্রকাশ করেননি।

হে মুছলিম মূসার মত, হয়রত ইবরাহীমের মত, ইমাম হোসাইনের মত তুমি অসত্যের বিরুদ্ধে খাড়া হয়ে দাঁড়াও।

হে ভারতের সাড়ে চার কোটি মুছলিম ভাই সকল! তোমরা তোমাদের অতীত ইতিহাসকে স্মরণ কর। বিভিন্ন ফিরকায়, বিভিন্ন দলে, বিভিন্ন মাযহাবে, বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত না হয়ে তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে যাও। বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্নতাকে পরিহার করে, তোমরা কুরআন ও হাদীছের মর্মকেন্দ্রে সমবেত হযে শিক্ষার দিকে সন্তান সন্ততিদিগকে এগিয়ে দাও। তোমরা চাকুরী পাবে, গদী পাবে, আসন পাবে। ভয়ের কোন কারণ নেই। সাড়ে চার কোটি মুসলমানদের অধিকারকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যারা সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হত না সেই বৃটিশ সিংহ তোমাদের অধিকারকে অস্বীকার করতে পারেনি।

হে মুছলিম! তুমি ঢেউ দেখে নৌকা ডুবিয়ে দিওনা, কুরআন বলছে- "আনতুমুল আলাওনা ইন কুনতুম মুমেনীন"। তোমরা উচ্চ আসন অধিকার করবে যদি তোমরা মুমেন হতে পার। যদি তোমরা আত্মশুদ্ধ হতে পারো।

হে মুছলিম! ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি আত্মনিয়োগ কর। কুরআন বলেছ- "জাহেদু ফি সাবিলিল্লাহে বে-আমওয়ালেকুম ওয়া আনফুছেকুম"। আল্লার জন্য, ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, শান্তির জন্য তুমি যাবতীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর; তোমার জান দিয়ে তোমার মাল দিয়ে। তুমি সর্বশক্তিকে নিয়োজিত রাখো আল্লার মনোনীত দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য।

হে মুছলিম পতিতকে উদ্ধার করবার জন্য,অন্ধকে পথ দেখানো জন্য, আর্তের সেবা করার জন্য, ব্যথিতের ব্যথা মোচনের জন্য, মূর্খকে জ্ঞান দানকরবার জন্য, স্বৈরাচার শাসকের অবসান ঘটবার জন্য তুমি জেগে ওঠো। জাগো নারী, জাগো পুরুষ, জাগো কিশোর, জাগো তরুণ, জাগো জ্ঞানী, জাগো মূর্খ-আবার তোমরা জাগো। *(৯ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা 'পয়গামে' প্রকাশিত)*

সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে নিশ্চয়

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করে জ্ঞান দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, বিবেক দিয়ে, শক্তি দিয়ে, সাহস দিয়ে, মনীষা দিয়ে, চেতনা দিয়ে, শৌর্য দিয়ে, বীর্য দিয়ে, চলৎশক্তি দিয়ে, দর্শন শক্তি দিয়ে, বাকশক্তি দিয়ে ও শ্রবণশক্তি দিয়ে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছে এবং উন্নতি অবনতির পথও

জানিয়ে দিয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তিকে কাজে লাগাতে পেরেছে, তারাই দুনিয়াকে করতলগত করে মহীয়সী জীবনের অধিকারী হতে পেরেছে। আর যারা আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তিকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারেনি তাদের মানব জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, তার অবনতির নিম্নস্তরে নেমে গেছে।

যখন কোন মানুষ উন্নতির দুর্ণিবার বাসনা নিয়ে জীবনের কর্মক্ষেত্রে পদনিক্ষেপ করে, তখন তার প্রত্যেক পদে পদে বাধা পড়ে। ইহাই হচ্ছে মানবত্ব লাভের পরীক্ষা। কিন্তু শত বাধা, শত ঝঞ্ঝা, শত বিপদ ও সমস্ত দুর্বলতাকে উপেক্ষা করে আল্লাহ তা'য়ালার উপর ভরসা রেখে কর্তব্য পথে অগ্রসর হতে থাকে, তারা সফল মনোরথ হতে পারে। কিন্তু যারা বিপদের মাঝে, বিভীষিকার মাঝে হিম্মত হারিয়ে দুর্বল ও কাপুরুষের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে, তাদের উন্নতির যাবতীয় রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

জেনে রাখুন! মানুষ যতক্ষণ বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করতে পেরেছে ততক্ষণ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির শেষ ধাপে পৌঁছতে পারে না। ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুললেই দেখা যায় পৃথিবীর বুকে কেবল ঐ সমস্ত লোক কামিয়াব হতে পেরেছে যারা কখন ভয়-ভীতির পরোয়া করেনি। মানুষের কর্ম জীবনের বিভিন্ন স্তরে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মানুষ নির্ভিকভাবে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েই অমরত্ব লাভ করেছে। পৃথিবীর যারা বীর সৈনিক তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আলেকজান্ডার, খালেদ বিন ওয়ালীদ, আবু ওবাইদা, নেপোলিয়ান, নদিম শাহ প্রভৃতি শত শত বীর পুরুষদের আপনি দেখতে পাবেন যাঁরা শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে দুনিয়ার বুকে বড় হতে পেরেছেন। কখনও তাঁরা দুর্বলতাকে মনের মাঝে স্থান দেননি। বাঁধা যতই বেড়েছে হিম্মতও ততই বেড়েছে। বেশী দূর যাব না, ভারতের বাদশাহ আকবরের কথা চিন্তা করলেই আমরা জানতে পারবো যে কত বাধা ও শত্রুতার মাঝে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। অনুরূপভাবে দরবেশ, ওলি আল্লাহদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখতে পাবেন তাঁরাও কষ্ট, দুঃখ, ব্যর্থতা ও বাধা-বিপত্তি পরোয়া করেননি। দুনিয়ার প্রসিদ্ধ ধনিক ও ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, তাঁরা ক্ষতি ও বিপদের আশঙ্কা হতে বেপরোয়া হয়ে কঠোর পরিশ্রমের ফলেই অগাধ ধন সম্পদের অধিকারী হতে পেরেছেন। তাঁদের কোশেশ দেখে ধন সম্পদ তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়েছে।

এই বিংশ শতাব্দীর নামজাদা ব্যক্তিদের অবস্থা চিন্তা করলে বুঝতে পারি তাঁরা চতুর্বিধ অশান্তি ও শত্রুতা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জগতের ইতিহাসে নাম আঁকতে পেরেছেন। দেখুন মুস্তফা কামাল শত ঝঞ্জার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুরস্ককে নব জীবন দান করেছেন। রেজা শাহ পাহপালভী, যিনি প্রথম জীবনে একজন মামুলী ধরণের লোক ছিলেন, যিনি যাবতীয় প্রতিকুল নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে ইরানের কর্তৃত্ব করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু শত তকলীফ বরদাশ্‌ত করে আজাদী হাসিল করতে সক্ষম হয়েছেন। দুনিয়ার কোন মানুষ কোন জাতি কখনো কৃতকার্য হতে পারে না, যতক্ষণ তার ভয়, ভীতি ও দুর্বলতাকে পরিহার করে নিঃশেষে আত্মবলিদান করতে পারে। দুনিয়ার উন্নতিশীল জাতির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে আছে সাহস ও বীরত্ব, ধৈর্য্য ও স্থৈর্য–আর তাদের মধ্যে আছে আঘাত প্রতিরোধ করার যোগ্য মনোবল এবং সেই মনোবলের কারণেই তার ক্রমাগতভাবে উন্নত হয়ে চলছে।

অতএর হে মুছলিম ভ্রাতৃবৃন্দ। আপনার যদি বড় হতে চান, নিজেদের উন্নতি করতে চান তাহলে নিঃশেষ আত্মবলিদান করতে শিখুন। হিংসুকের হিংসাকে, গর্বিত জনের তাচ্ছিল্য ও উপহাসকে অগ্রাহ্য করে, শত বিভীষিকা ও বিপদকে উপেক্ষা করে কর্ম সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আসুক ঝঞ্ঝা, আসুক ঝটিকা। ভয় কি? *(৯ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা ৩০জুলাই ১৯৫৭ অর্ধ সাপ্তাহিক পয়গামে প্রকাশিত)।*

এগিয়ে এস

মুছলমান! হে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম রাছূল (ছাঃ)-এর কালেমা পাঠকারী মুছলমান। ইছলামের জন্য, নিজের যথাসর্বস্ব বিসর্জনকারী মুছলমান। জালেম, অত্যাচারী ও স্বৈরাচারীর যাবতীয় ফন্দি-ফিকিরকে চুরমার করে আদালত ও ইনসাফের প্রতিষ্ঠাকারী মুছলমান! আজ তোমার সে অতীত গৌরব কোথায়?

মুছলমান! তুমি যখনই যে পথে ছুটেছ, সে পথেই তোমার সাধনা সফলতা লাভ করছে। জাতীয় গৌরবের বিজয় পতাকা তোমাকে তছলীম জানিয়েছে। তোমার সমুন্নত প্রত্যয় তাকদীরকে ওলট পালট করে ছেড়েছে। তোমার সুমহান ব্যক্তিত্ব অতি বড় আজাজীলেরও প্রাণে কম্পন জাগিয়েছে।

মুছলমান! তোমার সে হিম্মত ও ব্যক্তিত্ব আজ কোথায়? তুমি আজ চিন্তা কর। অনুধাবন করবার চেষ্টা কর! এখনও সময় আছে, তুমি গাফলতকে পরিহার কর। মুসলমান! তোমাকে আবার তোমার সর্বশক্তি আল্লাহ্‌র পথে নিয়োজিত করতে হবে। তুমি এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছো? কবে তোমার এ ঘুমের অবসান ঘটবে? কবে তোমার সম্বিৎ ফিরে আসবে? তুমি আজ সর্বরোগে জর্জরিত। তোমার অর্থ আছে, কিন্তু তা তুমি কাজে লাগাতে জানো না। উপযুক্ত পথে ব্যয় করতে জানো না। সিনেমা হলে তোমাদের সংখ্যা বেশী। জুয়া ও মদের আড্ডাগুলিকে তুমিই গুলজার করে রেখেছ। কোর্ট কাছারীকে তোমরাই সরগরম করে রেখেছ।

যাবতীয় অন্যায় হতে তোমরা ফিরে এসো। আপোসে দলাদলি, কাটাকাটি, হানাহানি, বিবাদ বিসম্বাদ ভুলে যাও। কেবল বড় হওয়ার চেষ্টা কর। যা শিক্ষা কর নাই তা শিক্ষা কর। যা বোঝ না তা বুঝতে শিখো। যা জানো না, তা জানতে শেখো। যারা উন্নতি করতে চায় না তাদের বেঁচে থাকার কোনই প্রয়োজন নাই।

মুছলমান! শিক্ষার দিকে তুমি অগ্রসর হও। বৈজ্ঞানিক হও, দার্শনিক হও, শিল্পী হও, ব্যবসায়ী হও, আলেম হও, পণ্ডিত হও, চিকিৎসাবিদ হও, সাহসী হও, বিশ্বাসী হও, যোদ্ধা হও, আদর্শ মানব হও। শরীর ও মনকে নূতনভাবে গড়বার চেষ্টা কর। বিলাসিতা বর্জন কর।

আজ আমাদের সমাজে নীচ চিন্তা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও পরস্পরের মধ্যে দলাদলি দেখা দিয়েছে। আমরা অসত্যকে সত্য মনে করে আসলকে ছেড়ে ছায়ার পশ্চাতে ছুটেছি। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আমরা সবকিছু করতে লজ্জাবোধ করি না।

মুছলমান! তুমি দুর্বলতাকে পরিহার কর। তোমার দেহে, তোমার মনে, তোমার সংকল্পে ও তোমার কর্ম প্রচেষ্টায় যেন কোন প্রকার দুর্বলতা স্থান না পায়। জেনে রেখো, দুর্বলতাই শয়তানের বাহন। সর্বপ্রকার দুর্বলতাই জীবনের সম্পদকে লুণ্ঠন করে। দুর্বলতার মাঝে নিহিত থাকে মিথ্যা, ভয় ও আত্মপ্রতারণা। মুছলমান-এই দুর্বলতার কারণেই তুমি আজ জগতের কাছে হেয়, তুচ্ছ, অবহেলিত ও অপমানিত। তুমি পাথরের চেয়েও কঠিন হও। হীরকের মত মূল্যবান হও। আর তীক্ষ্ণধার তরবারীর চেয়েও তীক্ষ্ণতম হও। তুমি উন্নত জীবনের সাধনায় ত্যাগ-সুন্দর ও আত্মবিলীন কর্মী হও।

তোমার অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আত্মনিয়োগ কর। যার যতটুকু ক্ষমতা তাই নিয়ে অগ্রসর হও। এগিয়ে এস ধনিক, এগিয়ে এস মূর্খ, এগিয়ে এস তরুণ, এগিয়ে এস যুবক, এগিয়ে এস নারী, এগিয়ে এস পুরুষ, ধ্বংসোন্মুখ মুছলিম সমাজকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এস। *(পয়গামে প্রকাশিত, ৯ম বর্ষ, ২৬ শে কার্তিক, মঙ্গলবার ১৩৬৪)।*

সাক্ষাৎকার

*['আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য জনাব আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ গত ১৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১ মাস যাবৎ মুম্বাইভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল 'পীস টিভি'র বাংলা বিভাগের আমন্ত্রণে বক্তব্য রেকর্ডের জন্য দুবাই গমন করেন। ইতিপূর্বে ২০০৯ সালে প্রাথমিকভাবে পীস টিভি বাংলার পক্ষ থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দেন এবং মোট ১২ জন বক্তার নাম নির্বাচন করে পাঠান। অত:পর চূড়ান্ত নির্বাচনের পর পীস টিভি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়া ও যুক্তরাজ্য থেকে মোট প্রায় ২০ জন আলোচকের নিকট আমন্ত্রণপত্র পাঠায়। ২০১০ সালে পীস টিভি কর্তৃপক্ষ আলোচকদের বেশ কয়েকবার মুম্বাইয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা নিয়ে ব্যর্থ হয়। অত:পর তারা নিজেরাই বাংলাদেশে আসার চেষ্টা নিয়েও ব্যর্থ হন। পরিশেষে এ বছর তারা দুবাইয়ে সার্বিক ব্যবস্থাপনা করতে সক্ষম হন এবং প্রায় এক মাস ধরে তারা আলোচকদের বক্তব্য ধারণ করেন। দীর্ঘ একমাসের দুবাই সফর থেকে ফিরে আসার পর জনাব আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফের এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন 'তাওহীদের ডাক'-এর পক্ষ থেকে **নূরুল ইসলাম ও আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**- নির্বাহী সম্পাদক]*

তাওহীদের ডাক : জনাব, আপনারা গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘ এক মাস দুবাইতে অনুষ্ঠিত পীস টিভি বাংলা'র জন্য বক্তব্য রেকর্ডের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন। তো গোটা সফরটা আপনাদের কেমন লেগেছে?

আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ : আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের সফরটা সব মিলিয়ে খুব সুন্দর হয়েছে। আমরা যে উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলাম, সে উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূরণ করতে পেরেছি বলেই মনে করছি এবং এর একটা সুফল ভোগ করব বলে আশা করছি। আমার মনে হয়েছে এতে করে আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীছের একটা উপযুক্ত খেদমত জাতির সামনে পেশ করতে সক্ষম হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : আমাদের জানা মতে আপনি বা আপনার সাথীদের বেশ অনেকেই ইতিপূর্বে ক্যামেরার সামনে এভাবে দাঁড়াননি। তো নতুন এই অভিজ্ঞতা আপনাদের জন্য কেমন ছিল?

আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ : এটাই ঠিক যে আমি ইতিপূর্বে কখনো ক্যামেরার সামনে বক্তব্য রাখিনি। উন্মুক্ত ময়দানে সাধারণ মানুষের সামনে বক্তব্য রাখাই আমাদের অভ্যাস। সেজন্য জনগণহীন পরিবেশে ক্যামেরার সামনে এভাবে বক্তব্য রাখা আমাদের জন্য প্রথমদিকে একটু ভারী মনে হয়েছিল। ক্যামেরার রেকর্ডিং-এর প্রাথমিক নিয়মকানুনগুলো অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বক্তব্য গুটিয়ে নিয়ে আসা, ক্ষণে ক্ষণে সতর্ক সংকেতের মুখে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা ইত্যাদি আমাদেরকে খুব বিব্রত করেছিল। পরবর্তীতে আলহামদুলিল্লাহ এতে অভ্যস্ত হয়ে যাই।

তাওহীদের ডাক : আপনাদের প্রাত্যহিক কর্মসূচি কি ছিল এবং দিনে কতগুলো বক্তব্য রেকর্ড করা হত?

আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ : আমরা দুবাইয়ে থাকতাম হোটেল কাসেল্স আল-বারশা'তে। সেখানে আমাদের প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে প্রস্তুত থাকতে বলা হত। এরই মধ্যে আমরা গোসল করে প্রস্তুতি নিয়ে নীচের রেস্টুরেন্টে সকালের নাস্তা সেরে নিতাম। অতঃপর পীস টিভি বাংলা'র গাড়ি এসে আমাদের নিয়ে যেত ৪০/৪৫ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত প্রোগ্রামস্থলে, মিরদীফ নামক একটি এপার্টমেন্টে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা, বা কখনো রাত ৮টা এমনকি রাত ১০টা পর্যন্ত টানা প্রোগ্রাম চলত। ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত টানা ৩ ঘন্টা, অতঃপর যোহরের ছালাত ও দুপুরের খাওয়ার বিরতি এবং সামান্য রেষ্ট নেওয়ার পর আবার টানা প্রোগ্রাম- এই ছিল সারাদিনের কর্মসূচি। প্রতিদিন ২৫ মিনিট সময়সীমার প্রায় ১০/১২টি বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য রেকর্ড করা হত। যেদিন গ্রুপ ডিসকাশন (টক শো) হত সেদিন জীঈ নামক আরেকটি বাসায় নিয়ে যাওয়া হত। এছাড়া শারজাহ শহরে আরব সাগরের উপকূলবর্তী মামযার পার্কে প্রস্তুত করা সেটে বক্তব্য প্রদানের জন্য ২দিন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর একদিন আরব সাগর থেকে কেটে নিয়ে আসা একটি কৃত্রিম ক্যানেলে জাহাজের ছাদে রেডি করা সেটে সারাদিন বক্তব্য রেখেছিলাম।

তাওহীদের ডাক : আপনার বক্তব্য/গ্রুপ ডিসকাশন সংখ্যা কতটি ছিল?

আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ : আমি নিজে অংশগ্রহণ করেছি প্রায় ৭০টি গ্রুপ ডিসকাশনে। আর একক বক্তব্য যাকে বলা হচ্ছে 'টিভি টক' তার সংখ্যা ছিল মোট ১০৫টি। 'মৃত্যু পরবর্তী যিন্দেগী' অর্থাৎ ক্বিয়ামত, কবরের জীবন, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রায় ৪০/৫০টি, 'ফাযায়েলে আমল'-এর উপর প্রায় ৩০টি, আর 'হালাল-হারাম' ও 'আদর্শ পরিবার' ইত্যাদি বিষয়ে বাকিগুলো। আমাদের আর আলোচকদের মধ্যে আমানুল্লাহ ভাই বেশীরভাগই গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করেন, হাফেয আখতার ভাই 'রিয়াযুছ ছালেহীন-এর ব্যাখ্যা' অনুষ্ঠানটিতে আলোচনা করেন আর মুযাফ্ফর প্রায় ৯০টি 'টিভি টক' এবং ৭২টি গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করেছে।

তাওহীদের ডাক : ডা: জাকির নায়েকের সাথে কি আপনাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল?

আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ : না, আমাদের দীর্ঘ সফরে ডা. জাকির নায়েকের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি। যদিও এ সময়ের মধ্যেই তাঁর দুবাই আসার কথা ছিল। কোন কারণবশত: শেষ পর্যন্ত তিনি আসতে পারেননি।

তাওহীদের ডাক : আপনাদের সফরসঙ্গী আর কারা ছিলেন? তাদের সাথে কি আপনাদের পারস্পরিক পরিচিতির সুযোগ হয়েছিল?

আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ : আমাদের সাথে পারস্পরিক পরিচিতিমূলক কোন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। এর একটা কারণ– আলোচকরা সবাই একসাথে দুবাই পৌঁছেননি। আর দ্বিতীয় কারণ হল, টানা প্রোগ্রাম। আমাদের জানা ছিল না একসাথে এতগুলো বক্তব্য রেকর্ড করা হবে। যাওয়ার পরদিনই এভাবে ঠাসা অনষ্ঠানসূচির কবলে পড়তে হবে– এটা আমাদের ধারণা ছিল না। তাদের টার্গেট ছিল আমাদের কাছ থেকে প্রায় ১৩০০ বক্তব্য রেকর্ড করা। এ কাজে তারা মুম্বাই থেকে প্রায় ৬০/৭০ জন লোক সাথে নিয়ে এসেছিল, যাদের পরিচালক ছিলেন ইযহার ফরীদী। প্রোগ্রামের প্রধান সমন্বয়ক শেখ নূরুল ইসলাম এবং অন্য একজন আব্দুল আলীম ব্যতীত সবাই ছিলেন উর্দূভাষী। প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য সর্বপ্রথম দুবাই উপস্থিত হন ড. মুছলেহুদ্দীন (টাঙ্গাইল), মুহাম্মাদ হারুণ (সিলেট), সাইফুদ্দীন বেলাল (দিনাজপুর), শহীদুল্লাহ খান মাদানী (ঠাকুরগাঁও) এবং হাফেয আখতার মাদানী (নওগাঁ)। আমি, মুযাফ্ফর বিন মুহসিন (যুবসংঘ সভাপতি), আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (ঢাকা যেলা আন্দোলন সভাপতি), শাহ ওয়ালীউল্লাহ (খত্বীব, সোবহানবাগ মসজিদ, ঢাকা) ও ইউসুফ আব্দুল মজীদ পৌঁছেন তিনদিন পর ১৯ শে মার্চ। আমাদের প্রায় ১ সপ্তাহ পর উপস্থিত হয়েছিলেন লণ্ডন প্রবাসী তিন বাঙ্গালী আব্দুর রহমান (বাগেরহাট), আবুল কালাম আযাদ (নোয়াখালী) এবং আব্দুস সালাম (সাতক্ষীরা)। শেষ সপ্তাহে এসে পৌঁছান ড. লোকমান (প্রফেসর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী (ময়মনসিংহ)। এছাড়া শায়খ মতীউর রহমান মাদানী, বাদরুদ্দোজা নদভী প্রমুখ ইণ্ডিয়ান বক্তারা ইতিপূর্বেই মুম্বাইতে যেয়ে বক্তব্য রেকর্ড করিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং সবার সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে একত্রিত হওয়ার সুযোগ আমাদের হয়নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে সবার সাথেই আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

তাওহীদের ডাক : আপনাদের প্রতি আয়োজকদের সহযোগিতা বা আতিথেয়তা কেমন ছিল?

আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ : প্রথমে কিছুটা সমস্যা হলেও পরবর্তীতে আদর-আপ্যায়ন, সহযোগিতা-সহানুভূতিতে তারা তেমন ত্রুটি করেননি। থাকার ব্যবস্থা ছিল আরব সাগরের পার্শ্বে চমৎকার পরিবেশে এক ফোর স্টার হোটেল 'কাসেল্স আল বারশা'তে। আর খানাপিনা ছিল খুব মানসম্মত ও উন্নত। যদিও আমাদের জন্য দেশীয় খাদ্যের ব্যবস্থা না থাকায় বেশ কষ্ট হয়েছে। আমাদের অন্যান্য সকল ব্যাপারেও তাদের যথেষ্ট নজর ছিল। বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম, যা তাদের সহযোগিতা না থাকলে উৎরানো কঠিন হয়ে যেত। আলহামদুলিল্লাহ এ সকল ব্যাপারে তারা আমাদের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন।

তাওহীদের ডাক : পীস টিভি বাংলা এ দেশের মানুষের মধ্যে কতটুকু প্রভাব রাখতে পারবে বলে আপনার মনে হয়?

আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ : এ দেশের মানুষের মধ্যে পীস টিভি বাংলা আশা করছি যে একটা ভাল প্রভাব রাখবে। এ কারণে যে, এ দেশে ধর্মের নামে বিভিন্ন চ্যানেল চালু রয়েছে । যেসব চ্যানেলের মাধ্যমে জাতি সঠিক দ্বীনী জ্ঞান অনেকাংশেই পাচ্ছে না। এই হিসাবে এই চ্যানেলটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথাযথ আলোচনা পেশ করছে- এ মর্মে জাতি এর দ্বারা বড় ধরনের উপকার পাবে বলে আমরা আশাবাদী। কিছু বিষয়ে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় যে, এর মাধ্যমে মানুষ কিছু উপকার হয়ত পাবে। যার প্রমাণ দেখছি– অনেক মানুষ আমাদেরকে বলছে যে, আপনার আলোচনা শুনলাম। খুব ভাল লেগেছে। আবার পথে-ঘাটে চলাচলের সময়ও কিছু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি। যেমন– কিছুদিন পূর্বে একটি টিকিট কাউন্টারের টিকিট নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি। এমন সময় একজন লোক আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনার নাম কি আব্দুর রায্যাক? বললাম, জ্বী হা। 'ও হ্যা! আমরা পীস টিভি বাংলায় আপনাকে বক্তব্য দিতে শুনলাম, ভাল লেগেছে।' এতে মনে হল, যে সব মানুষ সারাদিন টিভির সামনে বসে থাকে তারা মনে হয় ভালো কিছুও দেখে। এতে মনে হচ্ছে এ শ্রেণীর লোকদের কিছু উপকারে আসবে চ্যানেলটি। বিশেষত চ্যানেলটির কারণে এই শ্রেণীর মানুষ হয়ত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য নতুনভাবে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। এটা আশার কথা।

> সর্বোপরি আমার একান্ত বিশ্বাস, ওলামায়ে সালাফ অর্থাৎ আমাদের পূর্বসুরী ওলামাগণ যে খোলামাঠে, উন্মুক্ত ময়দানে যেয়ে মানুষকে দ্বীনের কথা শুনিয়েছেন তাতে খুলূছিয়াত অনেক বেশী আছে, এতেই অনেক পাপ থেকে মুক্তির ব্যাপার আছে, আর এতেই আল্লাহর কুবুলিয়াত বেশী আছে। এটাই আমি বুঝি।

তাওহীদের ডাক : পীস টিভি বাংলা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এটা অত্যন্ত আশার কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নীতির উপর তারা কতটুকু টিকে থাকতে পারবে বলে আপনার মনে হয়?

আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ : আয়োজকদেরকে উপস্থিত যতটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয় তাদের উপর আস্থা রাখা যায়। আশা করা যায় যে, তারা নীতির উপর টিকে থাকতে পারবে এবং ইনশাআল্লাহ তারা এতে সফল হবে। তাদের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত উন্নতমানের এবং তাদের নীতির উপর টিকে থাকার আত্মবিশ্বাস আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ মনে হয়েছে।

তাওহীদের ডাক : জনাব, উন্মুক্ত ময়দান এবং মিডিয়া উভয় ক্ষেত্রেই আপনার রয়েছে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। এখন আমাদের প্রশ্ন, এ দু'টি মাধ্যমের মধ্যে কোনটিকে আপনি সমাজ সংস্কারের জন্য অধিক ফলপ্রসূ মনে করেন?

আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ : দু'টি মাধ্যম আসলে দু'ভাবে কাজ করতে পারে। খোলা ময়দানের বক্তব্যে সাধারণ জনগণ, সাধারণ নারী-পুরুষ সবাই উপস্থিত হয়, এ দিক চিন্তা করলে এ মাধ্যমেই দ্বীন প্রচারের সুফল বেশী। কেননা এতে সাধারণ জনগণ সরাসরি উপকার লাভ করতে পারে এবং এতে তাদের মধ্যে প্রভাব বেশী পড়ে। আবার টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে এমনও কত লোক আলোচনা শোনে, যারা হয়তবা কখনো উন্মুক্ত ময়দানে দ্বীনী আলোচনা শুনতে যায় না বা যাওয়ার সুযোগ হয় না। এ দিক দিয়ে বলা যেতে পারে টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষিত মানুষ বা যারা ধর্মকর্ম নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী নয়, তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ হবে এবং তাদেরকে দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনা সহজ হতে পারে। আর একটা ব্যাপার উন্মুক্ত ময়দানের তুলনায় টিভি মিডিয়ার দর্শক সংখ্যাও অনেক বেশী। সারাবিশ্ব থেকে বাঙ্গালীরা আমাদের আলোচনা শুনতে পারছে। এটা বড় একটা দিক নিশ্চয়।

তাওহীদের ডাক : জনাব, বর্তমানে টিভি মিডিয়ার কুপ্রভাবের দিকে যদি আমরা নজর দেই, তাহলে উন্মুক্ত ময়দানে দাওয়াত প্রদান এবং টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান– এ দু'টির মধ্যে কোনটিকে আপনি বেছে নিতে চাইবেন?

আব্দুর রায্‌যাক বিন ইউসুফ : আসলে যদি বিষয়টি এভাবে চিন্তা করা হয়, তাহলে মূলত: টিভি মিডিয়া আশীর্বাদ নয়; বরং অভিশাপই। এর উপকারী দিকটা গ্রহণ করতে যেয়ে এর অনৈতিক, অপকারী দিক থেকে মানুষ স্বীয় আত্মাকে কতটুকু নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে বা পারছে তা ভাববার বিষয়। টিভি মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার এদিক থেকে খুবই কঠিন। এই বিষয়টি নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করি যে, আসলে দ্বীনের ব্যাপারে এখানে কতটুকু সহযোগিতা করছি। ইতিমধ্যে অনেকেই বলছেন, আব্দুর রায্‌যাক ছাহেব যখন চ্যানেলে কথা বলছেন, তাহলে আমরা বাড়িতে একটা টিভি কিনি বা ডিশ লাইনের ব্যবস্থা নিই। বহু মানুষের মুখে ইতিমধ্যে এটা শুনছি। তখন আমি ভাবছি যে, আল্লাহ তুমি মাফ কর। আমরা ওখানে কল্যাণের আশায়ই গিয়েছি। মানুষ যদি এটা ভুল পথেই বেশী ব্যবহার করে, তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। সর্বোপরি আমার একান্ত বিশ্বাস, ওলামায়ে সালাফ অর্থাৎ আমাদের পূর্বসুরী আলেমগণ যে খোলা মাঠে, উন্মুক্ত ময়দানে যেয়ে মানুষকে দ্বীনের কথা শুনিয়েছেন, তাতে খুলূছিয়াত অনেক বেশী আছে। এতেই অনেক পাপ থেকে মুক্তির ব্যাপার আছে, আর এতেই আল্লাহর কুবূলিয়াত বেশী আছে। এটাই আমি বুঝি।

তাওহীদের ডাক : আপনার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা, সুখকর বা তিক্তকর?

আব্দুর রায্‌যাক বিন ইউসুফ : ওখানে গিয়ে বিশেষ করে আমার জন্য কষ্টকর ব্যাপার ছিল এই যে, পীস টিভিতে এভাবে কথা বলতে হবে এ মর্মে আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। যদিও আমরা বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এত বেশী বক্তব্য দিতে হবে তাও ছিল আমাদের চিন্তার বাইরে। আমরা ভাবছিলাম যে, আমাদের প্রতি মনে হয় অত্যাচার করা হচ্ছে। যদি এই আয়োজন আমাদের দেশে হত, বা আমাদের চলে যাওয়ার কোন পথ-ঘাট থাকত, হয়তবা আমরা এ সব ছেড়ে চলে যেতাম। আমরা ভাবছিলাম আমরা ওদের যুলুমের শিকার। আর ওরা ভাবছে যে, তাদেরকে যে কোন মূল্যে ১৩০০ প্রোগ্রাম রেকর্ড করতেই হবে। উপরন্তু অজ্ঞাত কোন বিষয়ে হঠাৎ করে টক শো বা টিভি টক-এ বক্তব্য রাখাটাও আমাদের জন্য ছিল বড়ই অস্বস্তিকর। ফলে সফরের প্রথমদিকে প্রোগ্রামের বিপুল চাপ আমাদের জন্য খুব কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। আর খাবার-দাবার নিয়েও আমরা অসুবিধায় ভুগেছিলাম। অতি উন্নতমানের হলেও সে খাবার আমাদের রুচির সাথে এডজাস্ট হত না। সব মিলিয়ে আমরা প্রথমে ভাবছিলাম আমাদের বুঝি এখানে আর থাকা হবে না। দেশে থাকলে এ সিদ্ধান্ত নিতে আমরা মোটেও দেরী করতাম না। আর মজার অভিজ্ঞতা হল এই যে, ধীরে ধীরে এই জটিল পরিবেশের সাথে আমরা যখন অভ্যস্ত হয়ে গেলাম, তখন তাদেরকে দেখলাম যে, বিশেষ করে আমাদের ৩ জনের (আমি, মুযাফফর ও হাফেয আখতার) প্রতি তারা খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছে। যেসব কাজ তারা আমাদের কাছে চাইছে তা আমাদের কাছে সুচারুভাবে পেয়ে তারা ছিল বেজায় সন্তুষ্ট। এ জন্য সফরের শেষদিনে বিশেষ করে আমাদের সম্মানে তারা দুবাই শহর ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। সেদিন আমাদের ৩ জনের কাছ থেকে তারা আর কাজ নেননি। তাই এই দিনটি ছিল আমাদের জন্য সদ্য জেলখানা থেকে মুক্তির মত আনন্দের। এদিন আমরা বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন ১৬৩ তলাবিশিষ্ট ২৭১৭ ফুট উচ্চতার 'বুর্জ খলীফা' টাওয়ার (ব্যায়বহুল হওয়ায় টাওয়ারে উঠা হয় নি) এবং তার পার্শ্বেই অবস্থিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ শপিং সেন্টার 'দুবাই মল' পরিদর্শন করলাম। এখানে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম এ্যাকুরিয়ামটি দেখে আমরা বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

*

টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে এমনও কত লোক আলোচনা শোনে যারা হয়তবা কখনো উন্মুক্ত ময়দানে দ্বীনী আলোচনা শুনতে যায় না বা যাওয়ার সুযোগ হয় না। এ দিক দিয়ে বলা যেতে পারে টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষিত মানুষ বা যারা ধর্মকর্ম নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী নয়, তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ হবে এবং তাদেরকে দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনা সহজ হবে।

*

তাওহীদের ডাক : দুবাই শহর কেমন দেখলেন?

আব্দুর রায্‌যাক বিন ইউসুফ : দুবাই শহরটা প্রশাসনিক দিক দিয়ে খুব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর। রাস্তাঘাটে পায়ে হেঁটে কোন মানুষজন চলাচল করে না। চারিদিকে খুব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। ট্রাফিক সিগন্যাল পড়া মাত্রই গাড়িগুলো সব থেমে যাচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশ নেই। অথচ কারো মাঝে আইন লংঘনের প্রবণতা নেই। কেননা সিগন্যাল অমান্য করলেই মোটা অংকের জরিমানা দিতে হয়। মরুভূমির দেশ। কেবল মাঝারী সাইজের খেঁজুর গাছ ছাড়া অন্য কিছু দেখা যায় না। আমাদের দেশের রাস্তার পার্শ্বে শিশু, কড়ই বা এ জাতীয় যেসব গাছ লাগানো হয় তার কিছু কিছু সেখানেও লক্ষ্য করলাম। রাস্তার আইল্যান্ডগুলো চমৎকার ফুল ও পাতাবাহার গাছ দিয়ে সাজানো। মরুর দেশে এই সবুজের সমারোহ দেখে আশ্চর্য হতে হয়। পর্যটন শহর বলে বিধর্মী নারী-পুরুষের সংখ্যা দুবাইয়ে প্রচুর। তাদের পোশাক-আশাকে পশ্চিমা ছাপ। আর শহর জুড়ে কেবল হোটেল আর হোটেল। আবাসিক বাড়ির সংখ্যা খুবই কম। সামাজিক পরিবেশ বা মানুষের পারস্পরিক আচরণে কোথাও কোন উচ্ছৃংখলতা, অনিয়মতান্ত্রিকতার চিহ্ন পেলাম না।

দুবাই ছাড়াও আমরা আবুধাবী ও শারজাহ শহরে গিয়েছিলাম। আবুধাবীতে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম মসজিদ 'শেখ যায়েদ গ্রাণ্ড মসজিদ' পরিদর্শনে গেলাম। সেখানে আরব আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা ও ১ম বাদশাহ শেখ যায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের কবর রয়েছে। যার পার্শ্বে রাত-দিন ২৪ ঘণ্টা কুরআন তেলাওয়াত করা হয়। প্রতি ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট পর পর তেলাওয়াতকারী পরিবর্তন হচ্ছে। যাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন ৮ হাজার দিরহাম এবং বখশিশ আরো ৩ হাজার দিরহাম। এ ধরনের বিদ'আত বিশ্বের আর কোথাও চালু আছে কি না আমার জানা নেই। এ মসজিদের কার্পেটটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ কার্পেট (৬০,৫৭০ বর্গফুট)।

তাওহীদের ডাক : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান মতামত ও অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য। আশা করি আমরা সকলেই এ থেকে উপকৃত হব। জাযাকাল্লাহু খাইরান।

আব্দুর রায্‌যাক বিন ইউসুফ : শুকরিয়া, বারাকাল্লাহু ফীকুম।

লিবিয়া : পশ্চিমা থাবায় বিপন্ন আরেক মুসলিম দেশ

-শেখ আব্দুছ ছামাদ

একটি বিশাল ভূ-ভাগের সম্মিলিত নাম মধ্যপ্রাচ্য। বিশ্ব সভ্যতার এক সুপ্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল কেন্দ্রভূমি এই মধ্যপ্রাচ্য। এ অঞ্চলের প্রায় সকল রাষ্ট্রেই রাজতন্ত্র প্রচলিত। ফলে আর যাই হোক এ রাজতন্ত্র অন্ততঃ বিগত কয়েক দশক যাবৎ এ অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোটামুটি স্থিতিশীল রেখেছিল। ব্যতিক্রম ছিল শুধুমাত্র ফিলিস্তীন। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় হঠাৎ করে গত ১৪ জানুয়ারী'১১ তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট বেন আলীর পতনের মধ্য দিয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল গণআন্দোলনের বহ্নিশিখা। তিউনিসিয়া, মিশর, জর্ডান, লেবানন, মরক্কো, আলজেরিয়া ও সিরিয়া হয়ে এ গণবিক্ষোভের অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে আফ্রিকা মহাদেশের ৯৭% মুসলমানের দেশ লিবিয়ায়। প্রতিটি রাষ্ট্রের বিক্ষোভকারীদের একটাই দাবী- সরকার পতন। এতদ্ভিন্ন অন্যকোন দাবী তাদের নিকটে একেবারেই গৌণ ছিল। জনরোষে তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট যায়নুল আবেদীন বিন আলীর (বেন আলী) ক্ষমতা ছেড়ে পলায়নের কারণে মধ্যপ্রাচ্য তথা মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিক্ষোভকরীরা আরো বিপুল উৎসাহে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে একের পর এক সরকার বিরোধী বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মিশরে গণআন্দোলনে দীর্ঘ ৩০ বছর ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে থাকা প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারকের পতনের পরপরই সুদীর্ঘ চার দশক ব্যাপী ক্ষমতায় থাকা লিবিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি কর্নেল মুআম্মার গাদ্দাফির বিরুদ্ধে শুরু হয় আন্দোলন। যা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা এসমস্ত রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধে হঠাৎ করে কেনইবা জনগণের এই বিক্ষোভ? এর উদ্দেশ্যইবা কি? বিশ্বের অন্যান্য দেশের পরিবর্তে শুধুমাত্র মুসলিম দেশগুলোতে এই আন্দোলন কেন? আন্দোলনের উৎস কি? আর এ আন্দোলনকারীদের খুঁটির জোরইবা কোথায়? এ সমস্ত বিষয়সহ সংঘাতময় লিবিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

লিবিয়া পরিচিতি : আফ্রিকা মহাদেশের ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত উত্তর আফ্রিকার একটি দেশ লিবিয়া। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে মিশর, দক্ষিণ-পূর্বে সুদান, দক্ষিণে শাদ ও নাইজার এবং পশ্চিমে আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়া। রাজধানী : ত্রিপোলী। আয়তন : ১৭,৫৯,৫৪০ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা : ৫৫ লক্ষাধিক। এ জনসংখ্যার ৯৭% সুন্নী মুসলমান এবং শিক্ষার হার ৭৯.১%। প্রধান ভাষা : আরবী, ইতালীয় ও ইংরেজী। মাথাপিছু জিডিপি : ৬,৫১০ ডলার। দেশটিতে প্রায় ১৪০টি উপজাতি-গোত্র রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত লিবিয়া তিনটি (ত্রিপোলী, সাইরেনিকা ও ফেজান) পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি অঞ্চলেরই ভিন্ন ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে কার্থেজিয়ানরা উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যবসায়িক কেন্দ্র স্থাপন করে এবং এ অঞ্চলটিকে 'ত্রিপোলিটানিয়া' নামকরণ করে। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে গ্রিকরা উত্তর-পূর্ব উপকূলীয় এলাকায় উপনিবেশ স্থাপন করে এবং এ অঞ্চলটিকে একটি প্রদেশে পরিণত করে। যার নামকরণ করা হয় 'সাইরেনিকা'। আর দক্ষিণ-পশ্চিম মরুভূমি অঞ্চলে বসবাস করত নোমাশরা। যে অঞ্চলটি পরিচিত ছিল 'ফেজান' নামে। ৬৪০ ও ৬৪২ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ত্রিপোলী ও সাইরেনিকা দখল করে নেয় আরবরা। পরবর্তীতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে অটোম্যান সাম্রাজ্য ত্রিপোলী, সাইরেনিকা ও ফেজান তিনটি অঞ্চলই নিজেদের দখলে নেয় এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইতালী কর্তৃক এ অঞ্চল তিনটি দখলের পূর্ব পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ত্রিপোলী এবং সাইরেনিকা ব্রিটিশদের অধীনে এবং ফেজান প্রদেশ ফরাসীদের অধীনে চলে যায়। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন সেনোসি উপজাতীয় শাসক আমির মুহাম্মাদ ইদ্রীস আল সেনুসিকে সাইরেনিকার আমির হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে জাতিসংঘের অনুমোদনের ভিত্তিতে এবং সাইরেনিকার আমিরের নেতৃত্বে লিবিয়া একটি ফেডারেল সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে লিবিয়া ইতালীর কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ঐ বছরেই ২৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘ লিবিয়াকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে।

গাদ্দাফির পরিচয় ও শাসনকাল : তাঁর পূর্ণ নাম মুআম্মার আল-গাদ্দাফী। জন্ম : ৭ জুন ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ইতালীয়ান লিবিয়ার সির্ট (Sirt) অঞ্চলে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ইতালীর কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে লিবিয়া শাসন করে চলেছিলেন বাদশাহ মুহাম্মাদ ইদ্রীস। কিন্তু বাদশাকে মোটেও পসন্দ হয়নি কর্নেল মুআম্মার গাদ্দাফির। ১৯৬৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর শারীরিক অসুস্থতার কারণে বাদশাহ ইদ্রীস তখন দেশের বাইরে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেও ভুল করেননি গাদ্দাফী। তাঁর অনুসারী সেনাবাহিনীর তরুণ কিছু কর্মকর্তাকে নিয়ে লিবিয়াতে এক রক্তপাতহীন সফল সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তিনি মাত্র ২৭ বছর বয়সে লিবিয়ার ক্ষমতা দখল করেন। মুহূর্তেই পাল্টে যায় লিবিয়ার প্রেক্ষাপট। নিজেকে রেভ্যুলেশনারী কমান্ড কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে জন্ম দেন 'রিপাবলিক অব লিবিয়া' নামে একটি রাজনৈতিক দলের। ১৯৭২ সালের ১৬ জানুয়ারী ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করে তিনি নিজেকে লিবিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করেন। এর দুই বছর পর তিনি লিবিয়ার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে 'নেতা' উপাধি গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র ত্রিপোলীতে বিমান হামলা চালায়। ১৯৮৮ সালে স্কটল্যান্ডের লকারবির আকাশে আমেরিকার বিমান হামলার পর লিবিয়া আন্তর্জাতিকভাবে একঘরে হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন পশ্চিমা অবরোধে থাকার পর ২০০৩ সালে পশ্চিমাদের সাথে পুনরায় তাঁর সুসম্পর্ক তৈরী হয়।

গাদ্দাফী বিরোধী আন্দোলন : তীব্র গণআন্দোলনের মুখে তিউনিসিয়া ও মিশরের প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর লিবিয়ার জনগণ উৎসাহিত হয়ে দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ একচেটিয়াভাবে ক্ষমতায় থাকা গাদ্দাফীকে উৎখাত করতে ১৫ ফেব্রুয়ারী হতে আন্দোলন শুরু করে। রাজধানী ত্রিপোলীর কেন্দ্রে অবস্থিত গ্রিন স্কয়ার (স্বাধীনতা স্কয়ার) হল এ আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের মাধ্যমে গোটা লিবিয়া দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। গাদ্দাফী বিরোধীরা পূর্বাঞ্চলে গাদ্দাফীর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে সেখানে একটি 'মুক্তাঞ্চল' প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে রাজধানীসহ পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ ত্রিপোলী ও তার আশপাশের এলাকা থাকে গাদ্দাফীর নিয়ন্ত্রণে। সেনাবাহিনীর ও মন্ত্রী পরিষদের কিছু সদস্য এবং প্রধান প্রধান কিছু গোত্র বিরোধী পক্ষে যোগ দেয়ার ফলে দেশটি কার্যত গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। সরকারী এবং বিরোধী উভয় পক্ষের গোলাগুলিতে অসংখ্য নিরস্ত্র সাধারণ জনগণ প্রাণ হারায়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বিরোধীপক্ষ দুর্বল হয়ে পিছু হটতে থাকে

এবং পশ্চিমাদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানায়। ফলে গৃহযুদ্ধ রূপ নেয় সর্বাত্মক যুদ্ধের।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব : বিরোধীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে লিবিয়ার সাধারণ জনগণকে সাহায্য ও মুক্ত করার নামে জাতিসংঘের ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদ এক বৈঠকে বসে। বৈঠকে ১৯৭৩নং প্রস্তাবের ভিত্তিতে লিবিয়ায় গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানানো হয় যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও লেবাননের পক্ষ থেকে। ১৫ সদস্যের মধ্যে ১০টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করে। অন্যদিকে বাকী পাঁচ সদস্য দেশ রাশিয়া, চীন, জার্মানী, ব্রাজিল ও ভারত ভোট প্রদানে বিরত থাকে।

নো ফ্লাই জোন ঘোষণা ও পশ্চিমা যৌথ বাহিনীর বিমান হামলা : লিবিয়ার কথিত গণতন্ত্রকামী এবং নীরিহ-নিরস্ত্র জনগণকে রক্ষার অজুহাতে নিরাপত্ত পরিষদের অধিকাংশ সদস্য দেশের ভোট পেয়ে প্রস্তাব অনুযায়ী লিবিয়াকে 'নো ফ্লাই জোন' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সাথে সাথে প্রস্তাবটি কার্যকর করার জন্য যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও লেবাননের যৌথ বাহিনী ১৯ মার্চ হতে লিবিয়ায় শুরু করে সামরিক অভিযান 'অপারেশন ওডিসি ডন'। যৌথ বাহিনী আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করে প্রতিদিন নৃশংসভাবে হত্যা করছে শত শত অসহায় শিশু ও নিরস্ত্র-নিরপরাধ নারী-পুরুষকে। ধ্বংস করা হচ্ছে বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক স্থাপনা। এদিকে মুআম্মার গাদ্দাফীর পক্ষ থেকে একাধিকবার যুদ্ধ বিরতি ও শান্তি প্রস্তাব পেশ করা হলেও তা প্রত্যাখ্যান করে যৌথ বাহিনী তাদের যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে। ফলে দেশটি যে অদূর ভবিষ্যতে ইরাক ও আফগানিস্তানে পরিণত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আন্দোলনের উৎস : গোটা মুসলিম বিশ্বজুড়ে যে গণআন্দোলন চলছে তার উৎস আসলে কি? জনগণ কি আসলেই দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা রাজতন্ত্রের পরিবর্তে পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত বস্তাপঁচা গণতন্ত্র চায়? নাকি এর পিছনে অন্যকোন স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্র আছে? যদি প্রথমোক্ত কারণটিই মুখ্য হয়ে থাকে তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এতদিন কেউ মুখ খোলেনি কেন? হঠাৎ করে কেন মুসলিম বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের জনগণ একের পর এক সরকার বিরোধী বিক্ষোভ শুরু করল? এ বিক্ষোভ ও আন্দোলনের কারণগুলোও সাধারণতঃ সবদেশে এক ও অভিন্ন। আর শুধুমাত্র রাজতন্ত্র পরিবর্তনের এই একটি ইস্যু এভাবে এত বড় বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে আদৌ কি সক্ষম? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ও রহস্যের উৎস খুঁজতে প্রথমেই আমাদের সামনে আসে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী মহল। যারা সবসময় সুযোগ মত ইসলামের সর্বনাশ সাধনে তৎপর। এদের লক্ষ্য সর্বদা মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের সর্বনাশ করা এবং মুসলিম দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করা। মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনা প্রবাহে এমনটিই অনুমিত হচ্ছে।

এটা স্পষ্টতঃই অনুভূত হচ্ছে যে, ইসলামবিদ্বেষী একটি মহল সুচতুরভাবে পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে তাদের স্বার্থ হাছিলের জন্য। আমরা যদি একটু পিছনের দিকে ফিরে তাকিয়ে সাতশত বছর পূর্বের স্পেনীয় মুসলিম শাসনের পতনের ইতিহাস মন্থন করে দেখি, তাহলে এখনকার ঘটনা এবং তখনকার ঘটনার মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। তৎকালীন স্পেনের মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের সর্বনাশ করেছিল ইসলাম বিরোধী শক্তি। স্পেনে মুসলিম শাসনাবসানের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলা সৈন্যসহ গ্রানাডা নগরী ঘিরে ফেলে। বাদশাহ আবু আব্দুল্লাহ তখন তাঁর মন্ত্রীদের নিয়ে রাজদরবারে বসেছেন কর্তব্য-করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করতে। বাদশাহ সবার কাছে জানতে চাইলেন এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি? তখন তরুণ সেনাপতি মূসা বিন আবী গাস্সান দাঁড়িয়ে বললেন 'হে বাদশাহ! আমরা মুসলিম জাতি। আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংগ্রাম ও সাহসিকতার। আমাদের শরীরে সেই বীরদের রক্ত প্রবাহিত যারা নিজেদের রক্তকে ইসলামের জন্য ঢেলে দিয়েছিলেন। মুসলিম জাতি চির অজেয়। তাই আমার পরামর্শ হল জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইসলামের জন্য যুদ্ধ করব। আসুন, আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি...'। কিন্তু গাদ্দারে ভরা রাজদরবারে তার এই তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ শ্রবণের কেউ ছিল না। ফলে শত্রুবাহিনীর সাথে সন্ধির পক্ষেই সবাই মত দিল। যা চিরকালের জন্য স্পেনের ভাগ্যাকাশে লিখে দিল গোলামীর কালিমা। স্পেন থেকে চির বিদায় নিল ইসলামী শাসন। বর্তমানেও ঠিক ঐ একই মহল যে, মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তা আর বলার অবকাশ রাখে না।

ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য : এ গণআন্দোলনে পাশ্চাত্যের স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের গন্ধ সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছে। তারা জনগণকে গণতন্ত্রের সুড়সুড়ি দিয়ে নষ্ট করছে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের শান্তি ও স্থিতিশীলতা। যার অনিবার্য ভবিষ্যত হতে পারে মুসলিম বিশ্বের ভাঙ্গন। মুসলিম বিশ্বকে কব্জা করার এটিই অন্যতম একটি কৌশল পশ্চিমা বিশ্বের। কারণ তারা ভালভাবেই জানে যে, একখানা আস্ত রুটি একত্রে গিলে খাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং 'Devide and Rule 'পৃথক কর এবং শাসন কর' এ নীতিকে সামনে রেখেই তারা এগিয়ে চলেছে তাদের লক্ষ্যপানে।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশ তেল সমৃদ্ধ। আফ্রিকায় তেলনির্ভর দেশগুলোর মধ্যে লিবিয়া অন্যতম। এদিক দিয়ে নাইজেরিয়া ও আলজেরিয়া থেকেও এগিয়ে আছে দেশটি। লিবিয়ায় প্রমাণিত তেলের মজুদ ৪৬.৫ বিলিয়ন ব্যারেল, যা মিশরের ১০ গুণ এবং বিশ্ব মজুদের ৩.৫ শতাংশ। দৈনিক ১৪ থেকে ১৭ লাখ ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয় এখানে। এখানকার ৮৫ শতাংশেরও বেশী তেল রপ্তানি হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে। এ তেল সম্পদের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের শ্যেনদৃষ্টি বহুকাল পূর্ব থেকেই। সুতরাং পশ্চিমারা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তাদের পসন্দের 'কাকতাড়ুয়া' সরকার প্রতিষ্ঠা করে এ বিপুল তেল সম্পদ হাতিয়ে নেয়াও যে এ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য তা আজ সূর্যালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুসলমানেরা এক সময় বিশ্ব শাসন করলেও এখন মুসলিম বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। প্রবল পরাক্রমশালী সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধরাশায়ী করার পর মুসলিম বিশ্বকেই তারা তাদের একমাত্র প্রতিপক্ষ মনে করছে। তাই মুসলমানদের ঐক্য, সংহতি ও পুনর্জাগরণকে তারা ভাল চোখে দেখছে না। এজন্য নানা কৌশলে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাখছে। উপরন্তু কোন মুসলিম দেশ অর্থনৈতিক বা সমরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করলে, কিভাবে সে দেশকে পরাভূত করা যায় সে চেষ্টায় তারা আদাজল খেয়ে নেমে পড়ে। নিজেরা পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোন মুসলিম দেশ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হোক তা তারা কখনো চায় না। এজন্য প্রয়োজনে ঐ মুসলিম দেশের পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস করতেও তারা পিছপা হয় না। কোন মুসলিম দেশে হামলা করার সময় অন্য কোন মুসলিম দেশ যাতে প্রতিবাদ না করতে পারে সেজন্য তারা আগে থেকেই নানা অজুহাতে তাদের মুখে কুলুপ এঁটে দেয়। ২০০১ সালে আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং হে মুসলিম উম্মাহ! নিজেদের মাঝে অপ্রয়োজনীয় লড়াই বন্ধ করে নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করুন! পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত বস্তাপঁচা গণতন্ত্রকে পরিহার করে পরামর্শ ও সমঝোতার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করে মুসলিম ঐক্যকে সুদৃঢ় করুন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

▪ ***লেখক:*** *সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ*

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সালাফী আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে এর ভূমিকা

-মীযানুর রহমান

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার বিস্তারে খ্যাতি অর্জনকারী এক অনন্যসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়। বিগত অর্ধশত বছর যাবৎ মুসলিম বিশ্বের যুগশ্রেষ্ঠ এই বিদ্যাপীঠটি পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র কালিমাকে সমুন্নত করতে ও জনগণের মাঝে বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে সালাফে ছালেহীনের প্রদর্শিত পথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কেবলমাত্র সঠিক ইসলামকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ও নিবেদিত এমন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই। বাদশাহ ফাহাদ যথার্থই বলেছেন, 'কেবলমাত্র ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রচার ও প্রসারের মহৎ উদ্দেশ্যেই এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'। এজন্য সমসাময়িককালে এটি সালাফী আন্দোলনের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়টির পরিচিতি, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও মুসলিম বিশ্বে সালাফী দাওয়াতের প্রতিষ্ঠাদান ও বিকাশ সাধনে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস :

সঊদী বাদশাহ আব্দুল আযীয (১৮৭৬-১৯৫৩ খৃঃ) ছিলেন ইসলামী শিক্ষা বিস্তার এবং সালাফী আক্বীদা প্রচার ও প্রসারের জন্য অন্তঃপ্রাণ। তিনি ইসলামের শাশ্বত আক্বীদার সর্বাঙ্গীণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত বিদ্বানগণকে ঐক্যবদ্ধকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাদশাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, 'আমার দু'টি মহান দায়িত্ব, যা পালনে আমি কখনও অবহেলা করব না; এক-আল্লাহর কসম, আমার ও আমার সন্তানদের, এমনকি গোটা রাজপরিবারের সদস্যদের রক্ত 'আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর প্রেরিত রাসূল'-তাওহীদের এ মর্মবাণীকে সমুন্নত করতেই ব্যয়িত হবে ইনশাআল্লাহ'...।

সত্যিই তিনি নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তাঁর সুযোগ্য পুত্র সঊদ বিন আব্দুল আযীয (১৮৯৯-১৯৬৮ খৃঃ)। পিতার যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে তিনিও ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের শাশ্বত বাণী গোটা বিশ্বে পৌঁছে দেওয়ার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র 'মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার রাজকীয় ফরমান তাঁর হাত দিয়েই জারি হয়। অবশ্য এর পূর্বে বহু ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি, লেখক ও সাংবাদিক মহল থেকে এ ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোর প্রস্তাব আসতে থাকে। লেখনীর মাধ্যমে যাঁরা এ মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ওবাইদ মাদানী, আহমাদ আব্দুল্লাহ আল-ফামী, আমীন মাদানী, মুহাম্মাদ সাঈদ আল-আমূদী, আব্দুস সালাম, হাশেম হাফেয, গালিব হামযা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

অবশেষে বাদশাহ সঊদ বিন আব্দুল আযীয ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যকরী পদক্ষেপ হিসাবে এক রাজকীয় ফরমানে *(২৫.০৩.১৩৮১হিঃ/ ০৬.০৯.১৯৬১খৃঃ, ১১ নং সিদ্ধান্ত)* বলেন, 'শিক্ষার উন্নয়ন, জ্ঞানের প্রসার, কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে ছালেহীনের নির্দেশিত পথে অবিচল থাকা এবং ইসলামের মর্মবাণী গোটা বিশ্বে পৌঁছে দেওয়া আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। তাই আমরা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর নির্দেশনা প্রদান করলাম :

১. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামে মদীনায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবে।

২. এর আয়ের উৎস আমাদের নিজস্ব সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল হবে।

৩. ১৩৮১-১৩৮২ হিঃ/১৯৬১-৬২ খৃঃ শিক্ষাবর্ষে সার্বিক ব্যয়ের জন্য তিন মিলিয়ন রিয়াল বরাদ্দ থাকবে।

৪. সঊদী আরব ও বহির্বিশ্বের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক নীতিমালায় উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে'।

এভাবেই বাদশাহ সঊদ বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর তত্ত্বাবধানে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ সুসম্পন্ন হয়। বাদশাহ সঊদ বলেন, 'মহান আল্লাহ আমাদেরকে মদীনাতে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার তাওফীক্ব দান করেছেন। আমরা আশা করি, এটি মুসলমানদের ঐক্য, তাদের হারানো শক্তি পুনরুদ্ধার ও গৌরব অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হবে'।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

যেসব মহৎ ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, নিম্নে তার কয়েকটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ইসলামের শাশ্বত বাণী প্রচার ও প্রসার।

- ইসলামের মর্মবাণী প্রতিষ্ঠার চারা রোপণ এবং তার পরিচর্যা। এবং সাথে সাথে ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে বাস্তবিক অর্থে ধর্মপালনের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ- যার মূলভিত্তি হবে একনিষ্ঠভাবে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং কেবলমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ।

● গবেষণামূলক লেখনী এবং বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ। বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম, আরবী ভাষা এবং মুসলিম সমাজ যা সচরাচর প্রয়োজন মনে করে– জ্ঞানের এমন ক্ষেত্রসমূহে গবেষণাধর্মী লেখনীর প্রতি উৎসাহ প্রদান।

● জ্ঞানপিপাসু বহিরাগত মুসলিম ছাত্রদেরকে ইসলাম ও আরবী শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ করে গড়ে তোলা। তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ফক্বীহ করে গড়ে তোলা, যে ফিক্বহ তাদেরকে দাওয়াতী ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে ছালেহীনের কর্মের আলোকে মুসলমানদের দ্বীনী ও বৈষয়িক যাবতীয় সমস্যার উপযুক্ত সমাধানে সহায়তা করবে।

● ইসলামী বই-পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তা তাহকীক ও সম্পাদনা করত: প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

● বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এ সম্পর্ক জোরদার করণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ মন্ত্রণা পরিষদ সদস্যবৃন্দ :

২২.১২.১৩৮১ হিঃ/ ২৩.০৫.১৯৬২ ইং তারিখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরামর্শ সভার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর সঊদী আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম (১৩১১-১৩৮৯ হিঃ) -এর সভাপতিত্বে পরিচালিত উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. শায়খ আব্দুর রাযযাক আফীফী (মদীনা, সঊদী আরব)।

২. শায়খ হাসনাইন মাখলূফ (কায়রো, মিশর)।

৩. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (সাবেক চ্যান্সেলর, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)।

৪. শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ (সাবেক চ্যান্সেলর, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)।

৫. শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী (ইণ্ডিয়া)।

৬. প্রফেসর আলী আত-ত্বানত্বাভী (দামেশক, সিরিয়া)।

৭. শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন শানকীত্বী (শিক্ষক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)।

৮. শায়খ মুহাম্মাদ বাহজাহ আল-বায়ত্বার (সিরিয়া)।

৯. শায়খ মুহাম্মাদ সালেম আল-বায়হানী (এডেন, ইয়েমেন)।

১০. শায়খ মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভী (লাহোর, পাকিস্তান)।

১১. শায়খ মুহাম্মাদ বাহজাত আল-আছারী (বাগদাদ)।

১২. শায়খ আবুল আলা মওদূদী (পাকিস্তান)।

১৩. শায়খ মুহাম্মাদ আল-ফাযিল বিন আশূর (তিউনিশিয়া)।

১৪. প্রফেসর মুহাম্মাদ আল-মুবারক (দামেশক)।

১৫. শায়খ মুহাম্মাদ মাহমূদ আছ-ছাওয়াফ (মক্কা)।

১৬. শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (সাবেক শিক্ষক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)।

১৭. শায়খ আব্দুল্লাহ আল-ক্বালক্বীলী (জর্ডান)।

১৮. শায়খ মুহাম্মাদ ইউনুস (জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগলিক অবস্থান :

ইসলামী শিক্ষার অন্যতম প্রতীক এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ইসলামের প্রথম রাজধানী, অহির অবতরণস্থল, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় শহর মদীনার নয়নাভিরাম ভূখণ্ড, প্রসিদ্ধ আক্বীক্ব উপত্যকার পশ্চিম উপকূলে ঐতিহাসিক সা'দ ইবনুল আছ প্রাসাদের সন্নিকটে অবস্থিত।

অনুষদ ও ছাত্র সংখ্যা :

২/৬/১৩৮১ হিঃ (১১ নভেম্বর ১৯৬১ খৃঃ) সনে রবিবার একটি মাত্র অনুষদে (শরী'আহ) মাত্র ৮৫ জন ছাত্র নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমান মসজিদে নববীর খ্যাতিমান শিক্ষক যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ প্রথম ক্লাসটি নেন। যাই হোক, সময়ের আবর্তনে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী, কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা ও দক্ষ পরিচালনা এবং সঊদী সরকারের নিবীড় তত্ত্বাবধানের বদৌলতে বর্তমান পাঁচটি অনুষদে বিশ্বের ১৬০টিরও বেশী দেশ থেকে আগত ও স্থানীয় ছাত্রসহ প্রায় পনের হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করছেন। ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে নতুন ভর্তি করা হয়েছে ৬৫৭৮ জন শিক্ষার্থীকে। আগামীতে এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বর্তমান অনুষদগুলি হচ্ছে : শরী'আহ, দাওয়াহ ও উছূলে দ্বীন, কুরআনুল কারীম ও ইসলামিক স্টাডিজ, হাদীছ ও ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবী সাহিত্য।

১. শরী'আহ অনুষদ : এতে ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ এবং ইসলামী বিচারব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে একটি উচ্চতর ডিপ্লোমা বিভাগ রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় ছাত্রদের জন্য 'আন-নাযমাহ' (النظمة) নামে একটি বিশেষ বিভাগ রয়েছে।

২. দাওয়াহ ও উছূলে দ্বীন অনুষদ : এ অনুষদটি ১৩৮৬ হিঃ/১৯৬৬ খৃঃ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে রয়েছে চারটি বিভাগ– আক্বীদা, দাওয়াহ, ইতিহাস ও তারবিয়াহ।

৩. কুরআনুল কারীম ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ : এ অনুষদটি ১৩৯৪ হিঃ/১৯৭৪ খৃঃ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে দু'টি বিভাগ রয়েছে– ইলমুল ক্বিরাআত ও ইলমুত তাফসীর।

৪. হাদীছ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ : এ অনুষদটি ১৩৯৬ হিঃ/১৯৭৬ খৃঃ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে দু'টি বিভাগ রয়েছে– ফিক্বহুস সুন্নাহ ওয়া মাছাদিরুহা এবং উলূমুল হাদীছ।

৫. আরবী সাহিত্য অনুষদ : এ অনুষদটি ১৩৯৫ হিঃ/১৯৭৫ খৃঃ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতেও রয়েছে দু'টি বিভাগ– ভাষা বিভাগ এবং বালাগাত ও সাহিত্য বিভাগ।

উল্লেখ্য যে, এই অনুষদগুলিতে অনার্স (লিসান্স) এবং বিভাগসমূহে মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

অধ্যয়নরত ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা :

ছাত্রদের লেখাপড়া ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহন করে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ছাত্রদের মাসিক যে বৃত্তি প্রদান করা হয়, তা তাদের লেখাপড়া, খানাপিনা, পোষাক-পরিচ্ছদসহ যাবতীয় ব্যয়ের পরও উদ্বৃত্ত থেকে যায়। বই-পুস্তক ক্রয় বাবদ বার্ষিক এককালীন অর্থ প্রদান করা হয়। কোন ফি ছাড়াই ছাত্রদের উন্নত আবাসন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। বহিরাগত ছাত্রদেরকে প্রতি বছর বার্ষিক ছুটির সময় স্বদেশে যাতায়াতের জন্য বিমান টিকেট প্রদান করা হয়। প্রত্যেক দিন মাগরিব ও এশার ছালাত আদায়ের জন্য ছাত্রদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে মসজিদে নববীতে নিয়ে যাওয়া হয়। মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি-তে অধ্যয়নরত বিবাহিত ছাত্রদের পরিবার নিয়ে আসার ভিসা এবং উপযুক্ত আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়া মুসলিম সংখ্যালঘু দেশসমূহের ছাত্রদের পরিবার নিয়ে আসারও ভিসা প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য এত সুযোগ-সুবিধা বিশ্বের আর

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। সারা বিশ্বে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় সঊদী সরকার এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর মোটা অংকের আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করে আসছে।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ :

মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ও বিদ্বানদের পদধূলিতে গর্বিত হয়েছে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয বিন বায (১৩৩০-১৪২০হিঃ), শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বিত্বী, শায়খ আব্দুল ক্বাদের আল-হামাদ, শায়খ মুহাম্মাদ তাক্বীউদ্দীন আল-হেলালী, শায়খ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী (১৩৪৩-১৪১৮ হিঃ), শায়খ ওমর ফালাতাহ (১৩৪৫-১৪১৯ হিঃ), ড.মুহাম্মাদ বিন মাতার আয-যাহরানী, রবী বিন হাদী আল-মাদখালী, শাযখ মুহাম্মাদ আরিফা সালেম, শায়খ আকরাম যিয়া উমরী, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আল-হাকীম, বর্তমান চ্যান্সেলর শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম প্রমুখ। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিদ্বান,আর-রাহীকুল মাখতুম গ্রন্থের লেখক আল্লামা ছফিউল্লাহ মুবারকপুরী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

খ্যাতিমান ছাত্রবৃন্দ :

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত প্রায় লক্ষাধিক ছাত্র অত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছে। তন্মধ্যে ৬৬৩ জন ডক্টরেট, ১০৬৪ জন মাস্টার্স এবং বাকীরা অনার্স ডিগ্রী লাভ করেছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের আল্লামা এহসান ইলাহী যহীর (রহঃ)-এর মত অসংখ্য প্রথিতযশা মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছে। জর্ডানের বর্তমান প্রধান বিচারপতি, সঊদী আরবে নিযুক্ত বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই কীর্তিমান ছাত্র। সারা বিশ্ব জুড়ে এখানকার এমন অসংখ্য কীর্তিমান ছাত্র রয়েছেন যারা স্বদেশে-বিদেশে বড় বড় পদ অলংকৃত করেছেন।

বাংলাদেশী ছাত্রবৃন্দ : এখানকার খ্যাতিমান বাংলাদেশী ছাত্রদের মধ্যে ড. মঞ্জুরে ইলাহী (এসোসিয়েট প্রফেসর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর), ড. যাকারিয়া (চেয়ারম্যান, ফিক্বহ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), ড. মুহাম্মাদ সায়েফ উল্লাহ (প্রফেসর, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম), ড. এ, বি, এম, হিযবুল্লাহ (প্রফেসর, আল কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভর্তির নিয়মাবলী :

ক. শর্তসমূহ :

১. আবেদনকারীকে মুসলিম হতে হবে।

২. সঊদী অথবা অন্য কোন রাষ্ট্র হতে এইচ.এস.সি./আলিম অথবা সমমানের সনদপ্রাপ্ত হতে হবে এবং সনদ অর্জনের পাঁচ বছরের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

৩. একাডেমিক অথবা শিষ্টাচার লংঘনজনিত কোন কারণে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিস্কৃত হওয়া যাবে না।

৪. বয়স অনূর্ধ্ব পঁচিশ বছর হতে হবে।

৫. প্রার্থীকে সচ্চরিত্রের অধিকারী ও শারীরিকভাবে লেখাপড়ার উপযোগী হতে হবে।

৬. কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরীতে যুক্ত হওয়া যাবে না।

৭. আল-কুরআনুল কারীম অনুষদে ভর্তিচ্ছু ছাত্রকে অবশ্যই কুরআনের হাফেয হতে হবে।

খ. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র :

১. সর্বশেষ অর্জিত শিক্ষাসনদ (এইচ.এস.সি/আলিম/ মু'আদালাভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত সমমানসম্পন্ন সনদ)।

২. সর্বশেষ অর্জিত মার্কস্‌শীট (নম্বরপত্র)।

৩. সরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা ।

৪. নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে চারিত্রিক সনদপত্র।

৫. পরিচয়পত্র ও জন্মনিবন্ধন সনদ।

৬. পাসপোর্টের ফটোকপি।

৭. নির্ভরযোগ্য ডাক্তার/মেডিকেল প্রদত্ত হেলথ্ (লেখাপড়ার জন্য শারীরিক উপযোগিতা) সার্টিফিকেট।

৮. সাম্প্রতিক তোলা ৬ কপি (৪ বাই ৬´) সাইজের ছবি। প্রতিটি ছবির নীচে আরবীতে নিজের নাম লিখতে হবে।

৯. স্বদেশের কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠান বা মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত দু'জন মুসলিম ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে দু'টি প্রশংসাপত্র। উক্ত মুসলিম ব্যক্তিদ্বয়ের মোবাইল নম্বরসহ তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রশংসাপত্রের সাথে যুক্ত করতে হবে।

১০. আবেদন ২৩ অক্টোবর থেকে শুরু করে ২০ জানুয়ারীর মধ্যে করতে হবে।

১১. আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় লিখিত কাগজপত্র আরবীতে অনুবাদ করত: নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে।

গ. আবেদনের নিয়ম :

আবেদনপত্র অনলাইনে পূরণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওবেসাইটে (www.iu.edu.sa) প্রদত্ত অনলাইন ফর্মটি ধাপে ধাপে পূরণ করতে হবে এবং আবেদনকারীর ছবিসহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাগজপত্র নিম্নোক্ত ওয়েব এ্যাড্রেসে স্ক্যানিং করে পাঠাতে হবে : http://admission.iu.edu.sa

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'মুআদালাহ' বা অনুমোদন প্রদানের নিয়ম :

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাডমিশন ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের (عمادة القبول والتسجيل) প্রধান বরাবর আবেদনপত্র।

২. শিক্ষার প্রতিটি স্তরে ছাত্রভর্তির শর্তাবলীসহ প্রতিষ্ঠানের বিধিমালার এক কপি।

৩. প্রতিটি শিক্ষাস্তরের ক্লাস রুটিন।

৪. বার্ষিক পাঠ্য বিষয়সমূহের তালিকা এবং সাপ্তাহিক ক্লাস সংখ্যার বিবরণ।

৫. পরীক্ষা নীতির বিস্তারিত বর্ণনা।

৬. প্রতিটি শিক্ষাস্তরের নম্বরপত্রের সীলমোহরযুক্ত নমুনা।

৭. ছাত্রদের প্রদেয় সনদপত্রের সীলমোহরযুক্ত নমুনা।

৮. শিক্ষকবৃন্দের নামের তালিকা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং তাঁদের সনদপত্রের ফটোকপি।

৯. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাজেট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের খাত।

১০. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অধীনস্থ মাদরাসাসমূহের নাম এবং সেগুলির অবস্থানস্থল (যদি থাকে)।

১১. উল্লেখিত তথ্যাবলী জমা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ।

জঙ্গীবাদ দমনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা :

‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ তত্ত্বের উদ্ভাবক আমেরিকা ও তার তস্যমহল বিশ্বের কোথাও কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলে তার সাথে সংশ্লিষ্টদের কেন্দ্র করে প্রায়ই হীন স্বার্থ চরিতার্থ এবং সঠিক দ্বীন চর্চার নাষিমূল মদীনা ইসলামী বিশ্বাবিদ্যালয়ের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদাসম্পন্ন ছাত্ররা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিজ নিজ দেশে মানুষের মাঝে ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরার কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অমুসলিম বিশ্বের শ্যেনদৃষ্টি রয়েছে সবসময়। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে মাঝেমধ্যেই বিপাকে পড়তে হয় এবং মিথ্যা অপবাদের জবাব দিতে গলদঘর্ম হতে হয়। এই সমস্যার নিরসন ও মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া উগ্রবাদ ও চরমপন্থার ব্যাপারে যথাযথ দিকনির্দেশনা ও সামাজিক সচেতনা সৃষ্টির জন্য মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ৩১.০৩.২০১০ ইং তারিখে ‘দৃষ্টিভঙ্গির উগ্রতা ও উগ্র দৃষ্টিভঙ্গি : প্রেক্ষিত সন্ত্রাস’ (الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف) শিরোনামে তিনদিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলনে সারা বিশ্ব থেকে বহু চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদের স্বরূপ, কারণ এবং উহার ক্ষতিকর দিকসমূহ স্ব-স্ব লিখিত প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গোটা বিশ্বের গবেষকগণ পাঁচ শতাধিক প্রবন্ধ পেশ করেন। তন্মধ্যে ৮৩টি প্রবন্ধ সম্মেলনের জন্য নির্বাচন করা হয়, যা তিন দিনে মোট ১২টি অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়। যেখানে উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির কারণ, উৎস, উহার ক্ষতিকর দিকসমূহ এবং প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল কয়েকটি– ক. ইসলাম যে মধ্যমপন্থা, ন্যায়নিষ্ঠা ও উদারতার ধর্ম– তা জাতির সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। খ. ইসলামের নামে কতিপয় মানুষের বিপথে যাওয়ার পরিণতি স্পষ্ট করা। গ. সন্ত্রাস সাম্প্রতিক সময়ের বহুল আলোচিত একটি অপরাধ; নির্দিষ্ট কোন ধর্ম বা জাতির সাথে এর সম্পর্ক নেই, বিশেষত: ইসলামের সাথে এর সামান্যতম সম্পর্ক নেই– তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি।

সালাফী দাওয়াতের প্রসারে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা :

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, এটি এমন একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান– যা সারা বিশ্বে মহৎ কিছু লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামের এই আলোকস্তম্ভটি সারা বিশ্বে সালাফী দাওয়াত প্রসারে ও সমাজসেবায় যে খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে আসছে, তা সত্যিই তুলনাহীন। ইসলামী জ্ঞানপিপাসুদের সঠিক ইসলামী আক্বীদা-আমল শিক্ষা দান এবং তাদের অন্তরে নির্ভেজাল তাওহীদের বীজ বপন করে তাদেরকে একজন যোগ্য দাঈ ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে স্ব-স্ব দেশে প্রেরণের মহান দায়িত্ব নিয়েছে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় গোটা বিশ্বে সালাফী দাওয়াতের প্রসারে যেসব ভূমিকা পালন করে আসছে, তার কিছু নমুনা নীচে তুলে ধরা হল :

১. *সঊদী আরবের অভ্যন্তরে দাওয়াতী কাজ :* এ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দাওয়াতী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে নানা সাংস্কৃতিক ও দাওয়াতী কর্মসূচীর আয়োজন। যেমন :

● বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক শিক্ষক কর্তৃক মসজিদে নববীতে নিয়মিত পাঠদান, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তা‘লীমী বৈঠকের আয়োজন এবং সভা-সমিতিতে যোগদান। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে সারা বছর নিয়মিত সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা গ্রহণ।

● হজ্জের মৌসুমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে হাজীদের সঠিকভাবে হজ্জ পালনে সহযোগিতা ও তাদের সেবায় বিভিন্ন সেক্টরে ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

● বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দা‘ওয়াতী ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন। এসব কর্মসূচীতে সুনামধন্য শিক্ষকবৃন্দ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন এবং উপস্থিতিদের মাঝে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ইসলামী বই-পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

২. *আন্তর্জাতিক পরিসরে দা‘ওয়াতী কাজ :* মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সঊদী আরবের অভ্যন্তরেই নয়; বরং আন্তর্জাতিক পরিসরেও মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান জানায়। মুসলিম যুবকদেরকে সুশিক্ষিত করা এবং তাদেরকে বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষাদানেও এ বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নীচে এর কিছু নমুনা উল্লেখ করা হল :

● গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয় বহু সংখ্যক শিক্ষককে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষকে কিতাব ও ছহীহ সুন্নাহর দিকে আহ্বানের জন্য প্রেরণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় ঐসব শিক্ষকের মাধ্যমে মানুষের নানাবিধ সমস্যার সমাধান এবং জ্ঞানার্জনের পথে তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। এছাড়া বহু মুসলিম যুবককে শিক্ষা অনুদানও প্রদান করে।

● পবিত্র রামাযান মাসে মুছল্লীদের ইমামতি করার জন্য কতিপয় হাফেয শিক্ষক-ছাত্রকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করে থাকে। তাঁরা মসজিদ, মাদরাসা ও ইসলামিক সেন্টারে শরী‘আতের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ এবং শিক্ষাদান করে থাকেন।

● মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসম্পর্ক রাখে এবং কিতাব ও ছহীহ সুন্নাহর দাওয়াত প্রচারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

● বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রচার ও প্রসার এবং উহার পরিপন্থী বিষয় থেকে মানুষকে সাবধান করার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে। সালাফে ছালেহীনের নীতি অনুযায়ী নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত দেওয়াই এ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। এ কর্মসূচী সর্বপ্রথম ১৩৯৫ হিঃ/ ১৯৭৫খৃঃ সনে শুরু হয়। ১৪১৮ হিঃ/ ১৯৯৭ খৃঃ পর্যন্ত বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ব্রিটেন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, তুরস্ক, চীন, শ্রীলংকা, থাইল্যাণ্ড, রাশিয়া, সিয়েরালিয়ন, গিনি, ঘানা, ব্রাজিলসহ আরো অনেক দেশে প্রায় ২০০টিরও বেশী প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৩৬২ জন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষক হিসাবে ও ২৯৭২৫ জন ছাত্র প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

● গোটা বিশ্বে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর শিক্ষাদান এবং তা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুরআন কারীম, হাদীছ , সীরাতে রাসূল (ছাঃ), আক্বীদা বিষয়ক বই-

পুস্তকসহ ধর্মীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকাদি ও ক্যাসেট প্রকাশ করে এবং সেগুলি বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দাঈদের মাধ্যমে বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত কয়েক মিলিয়ন বই-পুস্তক ও ক্যাসেট বিতরণ করা হয়েছে।

● এ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় ৩০০০০ (ত্রিশ হাযার) ছাত্র অত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন শেষে স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করে কিতাব ও ছহীহ সুন্নাহর প্রচার ও প্রসারে কাজ করছে। বাংলাদেশে তাদের সংখ্যা প্রায় ৩৭৪ জন। আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত টোগো নামক দেশের জনৈক ছাত্র বলেন, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ ও উছূলে দ্বীন বিভাগ থেকে অধ্যয়ন সমাপ্তকারী ছাত্র শায়খ ইদরীস বর্তমানে সেদেশের খ্যাতিমান দাঈ এবং তার দাওয়াতে এ পর্যন্ত বহু সংখ্যক অমুসলিম ইসলামগ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পাপুয়া নিউগিনির শামস নামক জনৈক ছাত্র বলেন,এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন সমাপ্তকারী দাঈগণের দাওয়াতে তাদের দেশে এক-দুই করে বর্তমান নবমুসলিমের সংখ্যা প্রায় দু'হাযারে দাঁড়িয়েছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন সমাপ্তকারী এরকম হাযার হাযার ছাত্র গোটা বিশ্বের আনাচে-কানাচে দাঈ ও সমাজ সংস্কারকের মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। বিশ্বের এমন কোন ভূখণ্ড নেই, যেখানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্র নেই। আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি এবং বিশেষত: মুসলিম সংখ্যালঘু রাষ্ট্রসমূহে তাদের দাওয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

● এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরবর্তীতে সঊদী সরকারের অধীনে 'মাব'উছ' হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সালাফী দাওয়াতের প্রসার ঘটাচ্ছেন।

● এছাড়াও প্রবাসী মুসলমানদেরকে বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষাদান এবং অমুসলমানদের সামনে ইসলামের সঠিক রূপ, উহার মূলনীতি ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করত: তাদেরকে ইসলামে প্রবেশের আহ্বান জানানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় 'প্রবাসীদের শিক্ষাদান' নামক একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এ কেন্দ্রের দাওয়াতে এ পর্যন্ত শুধু মদীনাতেই এক হাযারেরও বেশী বিদেশী অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

● এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় 'ছহীহ সুন্নাহ ও সীরাতে রাসূল (ছাঃ)' এবং 'সমাজ সেবা' নামক দুটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, গোটা বিশ্বে সালাফী আন্দোলনে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা প্রকৃতার্থে বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে মোটেও সম্ভব নয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্বে সালাফী আন্দোলন তথা ইসলামের আদিরূপ প্রতিষ্ঠায় যে কতবড় পথিকৃৎ-এ পরিণত হয়েছে, তা বর্তমান বিশ্বে যারা প্রকৃতার্থে ইসলামের খেদমত করছেন এবং পলিনেশীয়, ল্যাটিন, ক্যারিবিয়ান বা অনুরূপ মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলসমূহে এ দাওয়াতের নিশান বহন করে চলেছেন তাদের প্রতি লক্ষ্য করলেই অনুধাবন করা যায়। বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বিরলপ্রায়, সেসব দেশ থেকে ছাত্র এনে তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে আবার স্বদেশে ইসলাম প্রচারের কাজে প্রেরণের এই মহৎ দায়িত্ব অহির প্রাণকেন্দ্রভূমির এই বিশ্ববিদ্যালয়টিই কেবল পালন করে যাচ্ছে। তাই কেবল একটি গতানুগতিক উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রই নয়, বরং বিশ্বব্যাপী বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে এক অনন্য আন্দোলন এ বিশ্ববিদ্যালয়। সঊদী বাদশাহ ফায়ছাল (রহঃ) ঠিকই বলেছেন, 'আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী রেনেসাঁর এমন ইঙ্গিত পাই, যা অন্তর্জগতকে পুলকিত করে এবং চিন্তা-চেতনাকে নাড়া দেয়। আমি এই প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক সফলতা কামনা করি এবং বিশ্বজুড়ে (কিতাব ও ছহীহ সুন্নাহর) বরকতময় দাওয়াতী অঙ্গনে তা ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করুক- এই প্রার্থনা করি।'

তথ্যসূত্র :

১. 'আল-কিতাব আল-ওয়াছায়েক্বী আনিল জামেআহ আল-ইসলামিইয়্যাহ'

২. 'আত-তাক্বরীর আল-মুজায'।

■ ***লেখক:*** *মীযানুর রহমান, ২য় বর্ষ, শরীআহ অনুষদ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও অর্থ সম্পাদক, 'যুবসংঘ' মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়।*

শেখ ইয়াহইয়া জোয়ান সুকুইল্লো্যো

শাকিরুল ইসলাম

[শেখ ইয়াহইয়া জোয়ান সুকুইল্ল্যো ইকুয়েডরের রাজধানী কুইটো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইকুয়েডরে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি জনসম্মুখে ইসলামগ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগর ঘেঁষে ইকুয়েডরের অবস্থান। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে লেবানন, ফিলিস্তীন, সিরিয়া ও মিসর থেকে অভিবাসী হয়ে হাতেগণা কিছু মুসলিম সর্বপ্রথম এ দেশে আগমন করে। কিন্তু তারা খুব সচেতনভাবে ধর্ম পালন করত না। তাই বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের আগ পর্যন্ত স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ছিল খুবই বিরল। তবে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভাগ্যের অন্বেষণে বিদেশে পাড়ি জমানো কিছু ন্যাটিভ ইকুয়েডরিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। এঁরা দেশে ফিরে ইসলাম প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে থাকেন। ফলে নব্বইয়ের দশক থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে ইকুয়েডরে মুসলিম জনসংখ্যা অভিবাসী-স্থানীয় মিলে পাঁচ-ছয় হাজারের মত। প্রতি শুক্রবারেই এখানে কমপক্ষে একজনের ইসলাম গ্রহণের দৃশ্য দেখা যায়। ১৯৮৮ সালে একটি মুসলিম সংগঠনের প্রচেষ্টায় কুইটো শহরে এ দেশের প্রথম মসজিদটি নির্মিত হয়। THE CENTRO ISLAMICO DEL ECUADOR MASJID. "ASSALAAM" এখানকার প্রথম মুসলিম সংগঠন, যেটি ইকুয়েডরিয়ান সরকারের স্বীকৃতি লাভ করেছে ১৯৯৪ সালে। সংস্থাটির যাবতীয় কার্যক্রম পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যা তার মূলনীতির শুরুতেই স্পষ্ট করে বলা আছে। এই সংস্থারই পরিচালক হিসাবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন শেখ ইয়াহইয়া জোয়ান সুকুইল্ল্যো। যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন। ইকুয়েডরের গুয়াকুইল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক নওমুসলিম ছাত্রী আছিয়া ফাতিমা ২০০৮ সালের মে মাসে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারটি বাংলাভাষী পাঠকদের উদ্দেশ্যে ভাষান্তর করেছেন শাকিরুল ইসলাম।– নির্বাহী সম্পাদক]

প্রশ্ন : আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন কি?

শেখ ইয়াহইয়া : আমি ইকুয়েডরের রাজধানী কুইটোতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং সেখানেই বড় হয়েছি। আমরা দুই ভাই ও এক বোন। আমি সবার বড়। আমার বাবা-মা আমাদের তিনজনকেই সমান ভালবাসা ও আদর-স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছেন। আমি ভাগ্যবান যে, এমন মনলোভা প্রীতিপূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে মানুষ হয়েছি। শৈশবে ছোট ভাইয়ের সাথে খেলনা গাড়ি চালানো আর আমার বাবার সাথে শিকারে বের হওয়া আমি খুব উপভোগ করতাম। বন্ধু নির্বাচনে আমি শুরু থেকেই বেশ শুকচেরা টাইপের ছিলাম। খুব ভদ্র আচরণের বন্ধুই ছিল আমার পছন্দনীয়।

প্রশ্ন : আপনার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

শেখ ইয়াহইয়া : আমি বারো বছর বয়সে একটি মিলিটারী একাডেমীতে শিক্ষা লাভ করি। যতদূর মনে পড়ে, আমি সেখানে কৃতি শিক্ষার্থী হিসাবে পুরস্কার লাভ করেছিলাম। মিলিটারী সাইন্স ও ম্যানেজমেন্ট– এই দু'টি বিষয়ে আমি ব্যাচেলর ডিগ্রী লাভ করি এবং পরবর্তীতে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যায়ে শরী'আ অনুষদ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করি। বর্তমানে আমি ইকুয়েডরের এক ইসলামিক সেন্টারের ইমাম হিসাবে কর্মরত। আমি ইংরেজী, স্প্যানিশ ও আরবী ভাষায় কথা বলতে পারি।

প্রশ্ন : সর্বপ্রথম কিভাবে আপনি ইসলামের সংস্পর্শে আসেন?

শেখ ইয়াহইয়া : আমি সর্বপ্রথম ইসলামের সংস্পর্শে আসি যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক প্রাক্তন আরব ক্লাসমেটের মাধ্যমে। ইসলামকে তখন আমার খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়। কেননা তা আমার কাছে ছিল প্রাকৃতিক, সহজ-সরল অনাড়ম্বর, আন্তরিক ও সম্মানপূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা। ইসলাম আমার উপকারে এসেছিল। কেননা এর মাধ্যমেই আমি একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পারলাম যে, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। ইসলাম প্রত্যেকের জন্যই এমন উপকার বয়ে আনতে পারে। কেননা এটি মানুষের নৈতিক ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সুগঠিত, পরিমার্জিত ও কাঠামোবদ্ধ করে দেয়। আমার পিতা-মাতা তাদের আজন্ম লালিত ভালবাসা দিয়ে আমার ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ইসলাম গ্রহণের পর আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল একজন উপযুক্ত স্ত্রী পাওয়া। আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছি। আমার ছয় সন্তান, যাদের দু'জন বিদেশে পড়াশোনা করছে। একজন মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে, আরেকজন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

প্রশ্ন : ল্যাটিন ও মুসলিম সংস্কৃতির মাঝে আপনি কোন সাদৃশ্য খুঁজে পান কি?

শেখ ইয়াহইয়া : হ্যা! অনেক। কেননা ল্যাটিন আমেরিকান জাতিসমূহ আদিতে স্পেনের অধিবাসী ছিল। ইসলামী সভ্য-সংস্কৃতির অনেক কিছুর সাথেই তাদের মিল পাওয়া যায়। আমাদের উভয়েরই রয়েছে পরিবার প্রথা। উভয়েরই রয়েছে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধার ঐতিহ্য। আমাদের ভাষার মূল উৎসও অভিন্ন। বহু স্প্যানিশ অক্ষর রয়েছে যা আরবী থেকে উদ্ভূত। যেমন– কামিসা (জামা), গাতো (বিড়াল) ইত্যাদি শব্দসমূহ। ল্যাটিন ও মুসলিম সংস্কৃতির লোকদেরকে দেখতেও অনেকটা একরকম মনে হয়।

প্রশ্ন : আপনার অভিজ্ঞতায় ল্যাটিন মুসলিম সম্প্রদায়কে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে মনে করেন?

শেখ ইয়াহইয়া : মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের সমস্যাগুলো সারাবিশ্বের মুসলমানদের বৈশ্বিক ইমেজে প্রভাব ফেলে। বহু অমুসলিম ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে মিডিয়ার একদেশদর্শী প্রচারণার ফলে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ দেখায়

না। এ সকল ভ্রান্ত ধারণা আমাদের কাজকে অনেক কঠিন করে দিয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি সমালোচকদের এ কথাকে কিভাবে নেন যারা বলেন, ল্যাটিন অঞ্চলে ইসলামী দাওয়াত মূলতঃ বিজাতীয় অনুপ্রবেশ?

শেখ ইয়াহইয়া : আমাদেরকে আসলে ল্যাটিন অঞ্চলে ইসলামী দাওয়াতের তাৎপর্য বুঝতে হবে। জাতীয়তাবাদ ইসলামে একটি ঘৃণীত বিষয়। ইসলামে আমরা সকলেই ভাই-বোন। তাই ল্যাটিন জনগণকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ায় কোন জাতীয়বাদী ছাপ খোঁজার সুযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ স্প্যানিশ ভাষায় দাওয়াত প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর অর্থ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো। আমাদেরকে বরং জোর আত্মজিজ্ঞাসায় বসতে হবে যে, কেন আরো বেশী সংখ্যক ল্যাটিন জনগণ ইসলাম গ্রহণে এগিয়ে আসছে না? যাতে আমরা তাদের প্রয়োজন, তাদের ভীতি-সংশয় এবং তাদের চিন্তা-ভাবনার আরো কাছাকাছি হতে পারি।

প্রশ্ন : আপনার কি এমন কোন মজার অভিজ্ঞতা, গল্প বা ব্যক্তিগত অর্জন রয়েছে, যা আমাদের সাথে শেয়ার করতে চাইবেন?

শেখ ইয়াহইয়া : হ্যা! আমি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম ইকুয়েডরিয়ান। আমিই প্রথম ইকুয়েডরিয়ান যে কোন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করেছে। ইকুয়েডরে প্রথম স্বীকৃত ইসলামী সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতেও রয়েছে আমার সহযোগিতা। আমাদের এই ইসলামী সেন্টারটি বহির্বিশ্ব থেকে কোন সাহায্য গ্রহণ করে না।

১৯৯৯ সালে আমি স্বপরিবারে হজ্জে গমন করি। জেদ্দা বিমানবন্দরে নামার পর কাস্টমস্ অফিসে আমার দেশের নাম 'ইকুয়েডর' বললে কাস্টম্স অফিসার তার কম্পিউটারে আমার দেশের নাম খুঁজে পেলেন না। তখন আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের দিকে তাকিয়ে আবেগে বলে ফেলেছিলাম, 'নিশ্চয়ই! আমরাই ইকুয়েডরের ইতিহাসে হজ্জে আগমনকারী প্রথম পরিবার!'

আমি চল্লিশেরও বেশী ইসলামী বই, পামফ্লেট এবং অডিও লেকচার ইংরেজী থেকে স্পানিশ ভাষায় অনুবাদে সহযোগিতা করেছি। আমার অনুবাদ করা কিছু বইয়ের নাম– "Understanding Islam and Muslims", "Muhammad in Bible", "Muslim Christian Dialogue", "The Miracles of Quan", "Human Rights in Islam"।

প্রশ্ন : বর্তমানে দক্ষিণ আমেরিকায় দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলুন।

শেখ ইয়াহইয়া : অধিকাংশ লোকই জানে না যে, দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিটি দেশের রাজধানী শহরেই ইসলামী সেন্টার রয়েছে। এখানে রয়েছে ৩৫টির মত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও ইসলামী সংগঠন। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের এ সকল সংগঠনসমূহের পরিচালকগণ ISESCO (ইসলামিক এডুকেশনাল সাইন্টিফিক এণ্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর বার্ষিক সমাবেশে একত্রিত হন। যেখানে তারা ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ ও মিডিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানদের ইমেজ বৃদ্ধির উপায়সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

প্রশ্ন : আপনার লক্ষ্যগুলো কি? কোন প্রত্যাশা বা সংশয় আছে কি?

শেখ ইয়াহইয়া : বেশ, অবশ্যই। আমি আল্লাহ্র সাথে আমার সম্পর্ক দৃঢ় করতে চাই। আমি ভয় করি আল্লাহর শাস্তিকে। আর আমি এক পরিশীলিত জীবনযাত্রার মানে উন্নীত হতে চাই। চাই একটি প্রশান্তিময় ও ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশ। আমার একান্ত কামনা– একটি শান্তিময় পৃথিবীকে দেখা। বিশ্বব্যাপী শান্তি বজায় রাখতে আমাদের সকলেরই প্রয়োজন– এক ও অভিন্ন একটি অবস্থান খোঁজা। পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং ছাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্তপূর্ণ জীবনী থেকে ইসলামের যেসব মূলনীতি ফুটে উঠেছে তা একটি শান্তিময়, দয়া-সহানুভূতির পৃথিবী গড়ার জন্য খুবই প্রয়োজন।

প্রশ্ন : ল্যাটিন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আপনার বিশেষ কোন বক্তব্য রয়েছে?

শেখ ইয়াহইয়া : হ্যা! আমাদের জন্য এক বিরাট ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে যদি আমরা সেজন্য কঠোর পরিশ্রম করি। আমাদের জন্য প্রয়োজন নিজেদের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের দাওয়াহ কর্মীদের (দাঈ) প্রশিক্ষিত করে তোলা– যেমন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং ইসলামিক লীডারশিপের মত বিষয়গুলোতে। আমাদের ভাই-বোনদেরকে বিদেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠানোর সুযোগ খুঁজতে হবে। আমাদের ভাই-বোনদের উৎসাহিত করতে হবে সম্ভব হলে যেন তারা নিজেদের দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হয়। আর আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এবং আমাদের মত অন্য যারা রয়েছে, তাদের সাথে কিভাবে এ্যাপ্রোচ করতে হবে সে বিষয়ে আমাদের পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন মুসলিম বিশ্বসংস্থাগুলোকে। পারস্পরিক যোগাযোগ এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ ইসলামী সম্মেলন ও কর্মশালাগুলোকে সারা বিশ্ব থেকে এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করার জন্য আমরা উৎসাহিত করতে পারি।

প্রশ্ন : সাধারণভাবে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আপনার বক্তব্য কি?

শেখ ইয়াহইয়া : আমাদের নবী মূসা (আঃ) তাঁর জীবনকালের ৪০ বছরেই ইহুদী সম্প্রদায়ের দাসত্বের মনোবৃত্তি উচ্ছেদ করেছিলেন। আমাদের শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মাত্র ২৩ বছরের মধ্যেই কাবাগৃহকে মূর্তির হাত থেকে উদ্ধার করেন। উল্লেখিত এই স্বল্পমেয়াদী টাইমলাইনগুলো বর্তমান পৃথিবীতে নতুন ইসলামী রেনেসাঁর জাগরণ ঘটাতে আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে। এ লক্ষ্যে সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারা অবশ্যই হতে হবে রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ের মত গতিশীল এবং পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিশীলভাবে নমনীয় অথচ দৃঢ় ও সুবিন্যস্ত। আর তা হতে হবে অবশ্যই আইন প্রণয়নের মূল সূত্র তথা পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহর যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে। আল্লাহ্র আনুগত্যে যদি আমরা একতাবদ্ধ হই, তবে আমরা দৃঢ়পদে দাঁড়াতে পারব। মানুষ হিসাবে আমরা সকলেই ভাই ভাই। আমাদের প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ আলোচনার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা এবং একে অপরকে গ্রহণ করার মনোবৃত্তি জাগ্রত করা। আর প্রকৃত হেদায়াত কেবলমাত্র আল্লাহ্র কাছ থেকে আসতে পারে। তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করে থাকেন। তাই বিশেষতঃ ল্যাটিন অঞ্চলে যারা দাওয়াতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তাদের প্রতি আমার উপদেশ– ধৈর্য ধরুন! কেবল ধৈর্য এবং ধৈর্য!!

ফয়েয মুহাম্মাদ

অনুবাদ : জাহিদুল ইসলাম

ফয়েয মুহাম্মাদ (১৯৭০-১৯৭১) জন্মগ্রহণ করেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে। মুসলিম পণ্ডিতবর্গের কাছে ইসলামী জ্ঞান অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তিনি সঊদী আরবে পাড়িজমান এবং ভর্তি হন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে দীর্ঘ ৪ বছর কাটানোর পর ইসলামের পথে মানুষকে দাওয়াত প্রদানের স্বপ্ন বুকে নিয়ে তিনি আবার সিডনীতে ফিরে আসেন। তার বক্তব্য প্রদানের চমৎকার ভঙ্গিমা বহু শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে, তা যেমন ফলপ্রসূ তেমনি মনোমুগ্ধকর। বর্তমানে তিনি মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে পি-এইচ.ডি রত। লেবানীজ বংশোদ্ভূত এই মুসলিম দাঈ ইতিপূর্বে সিডনীর শহরতলী লিবারপুলে 'গ্লোবাল ইসলামিক ইউথ সেন্টার'-এর পরিচালক ছিলেন। বৃটিশ টেলিভিশনের 'আনকভার মস্ক' শিরোনামের এক ডকুমেন্টারীতে তাঁকে উপস্থাপন করা হয়। মিডিয়ায় তাঁকে মৌলবাদী ধ্যান-ধারণার লোক এবং 'ওহাবী' বলে আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে।

শায়খ ফয়েয মুহাম্মাদ সিডনীতে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পূর্বপুরুষরা লেবাননের অধিবাসী। প্রথম জীবনে তিনি একজন মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। প্রাথমিক জীবনটা তাঁর খেলাধূলার মাঝে কেটেছে। ১৭ বছর বয়সে তিনি বক্সিং-এ টাইটেল অর্জন করেন এবং ১৯ বছর বয়সে 'অস্ট্রেলিয়ান বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশীপ' জয় করেন। কৈশোরের অধিকাংশ সময় তিনি সিডনী শহরের রাস্তায় রাস্তায় গ্যাংস্টার পরিবেশে কাটিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তার সাথে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না। তিনি অসি জীবনযাত্রার উপস্থাপিত যাবতীয় কিছু ভোগ করার জন্য বেপরোয়া স্বভাবের ছিলেন। কঠোর বৈশিষ্ট্য ও বেপরোয়া স্বভাবের কারণে মুষ্টিযুদ্ধে খ্যাতি লাভের দিনগুলোতে তাঁকে 'খুনী ফ্রাংক', অনুরূপভাবে বডিবিল্ডিং-এর দিনগুলোতে 'জন্তু' বলা হত। এত কিছু হাতের নাগালে থাকতেও তিনি আরো কিছুর অভাব বোধ করেন। তিনি যদিও কথিত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু চতুর্পার্শ্বের নেতিবাচক পরিবেশের কারণে সত্য দ্বীন সম্পর্কে জানার কোন চেষ্টা কখনো করেননি। রাস্তার পরিবেশে সেই কঠোর জীবন কাটানোর পর তিনি অনুভব করেন যে, তাঁর অস্তিত্বটা এভাবে দস্যুর মত বেঁচে থাকার চেয়ে নিশ্চয়ই আরো অর্থপূর্ণ। তিনি বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই সেখানে ত্রুটি পেলেন। একদিন কিছু প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য এক মসজিদে প্রবেশের পর তিনি অনুভব করলেন আল্লাহ তাঁকে হেদায়াতের জন্য এখানে প্রেরণ করেছেন, দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার জন্য নয়। তিনি সিডনীর মসজিদগুলোতে অনুষ্ঠিত তা'লীমী আলোচনা বৈঠকগুলোতে উপস্থিত হতে লাগলেন কিন্তু সেগুলোকে তাঁর কাছে অনাকর্ষণীয়, দুর্বোধ্য এবং যুবকদের জন্য গুরুত্বহীন মনে হল।

তিনি যখন আমেরিকায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হন, ঠিক তখনই তাঁর অন্তর্জগত ঈমানের প্রশান্তিময় সুবাতাসে ভরপুর হয়ে যায়। তিনি আপন অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে মহৎ এবং সর্বাধিক অর্থবহ কিছু অর্জনের জন্য আপন আলোয় জ্বলে উঠলেন। যার ফলশ্রুতিতে-সবকিছু পরিত্যাগ করে তিনি ইসলামের কেন্দ্রভূমি মদীনা যাত্রা করলেন। তিনি সেখানে দুই বছর আরবী ভাষা শিখলেন এবং পরবর্তী চার বছর শরী'আহ অনুষদে পড়াশোনা করে লিসান্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ডিগ্রি সমাপনের পর তিনি পুনরায় অস্ট্রেলিয়া ফিরে যান পথভ্রষ্ট তরুণদের চাহিদা পূরণের স্বপ্ন বুকে নিয়ে। ২০০০ সালে তিনি 'গ্লোবাল ইসলামিক ইউথ সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এটা এমন একটি শিক্ষাকেন্দ্র যা তরুণ সমাজকে আরো ভালো মুসলিম হিসাবে গড়ে উঠার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকে। এখানে যুবশিবির ও ইসলামের উপর প্রাথমিক ও গভীর জ্ঞানদানের নিয়মিত আয়োজন রয়েছে। এছাড়াও একটি শরীরচর্চাকেন্দ্র রয়েছে, রয়েছে বিনোদনের সুবিধাদিও।

তাঁর অনন্য বাচনভঙ্গি ও ইসলামের উপর দৃঢ়তা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে আকর্ষণ করেছে। স্বধর্মকে আধুনীকিকরণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণে তিনি সমালোচকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। এতদসত্বে তিনি আপন কর্তব্যে অবিচল। আল্লাহর বিধানে আস্থা ও আক্ষরিকভাবেই 'কোন আপোস নেই' নীতিকে তিনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রেখেছেন। তিনি কঠোর একনিষ্ঠতার সাথে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করেন। বর্তমানে তিনি মালয়েশিয়াতে পি-এইচ.ডি করছেন এবং সেখানেই বিভিন্ন দাওয়াতী কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে হেফাযত করুন- আমীন!!

জাতের বড়াই

-শরীফ আবু হায়াত অপু

প্রথম বর্ষের ছাত্র আমি তখন। জিইবি-১০৫ ইউনিটটি নিতেন শ্রদ্ধেয় আনোয়ার স্যার। তিনি আমাদের নেচার বনাম নার্চার বিতর্ক পড়িয়েছিলেন। মানুষ কেমন হবে তা নির্ধারণ করে কোনটি- জিনোম, যা তার কোষে কোষে আছে নাকি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, যাতে সে বেড়ে উঠেছে? জানলাম দুটোরই অবদান আছে, অর্ধেক-অর্ধেক। কিন্তু পরবর্তীতে দেখলাম শুধু এ-দুটো দিয়েই সব ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের আরো আছে রূহ বা আত্মাযার বুদ্ধিমত্তা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। এর বলেই মানুষ জিনোম এবং পরিবেশ উভয়ের প্রভাবকে জয় করতে পারে। মানুষের আছে বেছে নেয়ার ক্ষমতা- এই বেছে নেয়ার ক্ষমতাই মানুষকে জৈবিক পশুত্বের পর্যায় থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে উঠিয়ে দেয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য, যুগে যুগে মানুষ নিজেদের বিচার করার সময় জন্মের যতটা দাম দিয়েছে, কাজের ততটা দাম দেয়নি। 'জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভাল'- ধরনের নীতিবাক্যগুলো ভাব-সম্প্রসারণ করা ছাড়া অন্য কাজে লাগেনি। নায়ক চৌধুরি বংশের আর নায়িকা খান বংশের- এই দ্বন্দ্ব নিয়ে হাজারখানেক বাংলা সিনেমা তৈরী হয়েছে। সামন্ত যুগের বংশ বা গোত্র নিয়ে মানুষের যে অবস্থানটা ছিল, পুঁজিবাদী যুগে সেটা বৃহত্তর পরিসরে 'জাতি'র চেহারা নিয়ে নতুন মোড়কে হাজির হয়েছে। মানুষ এখন বংশের বড়াই না করে জাতীয়তাবাদের গৌরব করে। যেন 'পুরনো বোতলে নতুন মদ'। জাতীয়তাবাদের উগ্র মূর্তির চেহারা আমরা দেখি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। হিটলার বিশ্বাস করতো একমাত্র আর্য জার্মানদের অধিকার রয়েছে সমগ্র বিশ্ব শাসনের। কারণ আর্য জার্মানরা সৃষ্টিগতভাবে, জেনেটিকালি অন্য জাতিগুলোর চেয়ে উন্নত। সে ১ কোটি ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছিল শুধু এই নীতিবোধে! যে, সব জাতের কর্তব্য জার্মানদের সেবা করা এবং যারা তা করবে না তাদের পৃথিবীতে জীবিত থাকার অধিকার নেই।

১৯৪৫ সালে হিটলারের পতন ঘটলেও জাত্যাভিমানের কিন্তু অবসান ঘটেনি। জাতিগত কোন্দলের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি পোলিশদের প্রতি রাশানদের বর্বরতা, টুরসে আর্মেনিয়ানদের গণহত্যা, ইরাকে কুর্দীদের নিশ্চিহ্নাভিযান, রুয়াণ্ডার হুতু-তুতসিদের মাঝে সংঘটিত হত্যাকান্ড, শ্রীলঙ্কার তামিল-সিংহলিজ গৃহযুদ্ধ, বসনিয়ায় সার্ব কর্তৃক বসনিয়ানদের গণহত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। এথনিক ক্লিনসিং-এর পিছনে লুকিয়ে আছে এক জাতির মানুষদের প্রতি আরেক জাতির প্রবল ঘৃণা। আজকের তথাকথিত সুসভ্য জাত ফরাসি আর ইংরেজরা পনেরশ থেকে আঠারোশ শতাব্দীতে যা করেছে তাকে 'কুকুরের কামড়াকামড়ি' বললে কম বলা হয়। ল্যান্ড অফ ফ্রিডম নামে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদি নিবাসী ছোট ছোট নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর প্রতি বর্বরতার ইতিহাস অনেক ঢাকা-ঢুকো দেবার পরেও যতটা বেরিয়ে আসে তা জানলে রীতিমতো হতবাক হতে হয়।

আরো ন্যক্কারজনক ব্যাপার হল এক জাতি আরেক জাতিসত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তাদের সম্পদকে দখল করবে, এটাকে অন্যায় হিসেবেও দেখা হয় না। ডারউইনিজমের হাত ধরে আসা সোশ্যাল ডারউইনিজম বলে- যে জাতি বেশি সক্ষম সে জাতি অন্য জাতিকে ধরে খাবে। সার্ভাইবল অফ দ্য ফিটেস্ট, এটা নাকি প্রকৃতির নিয়ম - এতে অন্যায় কিছু নেই! হোমো স্যাপিয়েন জাত দু'ভাগে বিভক্ত-সাদা চামড়ার হোমো সুপেরিয়র আর বাদামি-কালো চামড়ার হোমো ইনফেরিয়র। এমন বিশ্বাস নিয়ে বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট, শ্যোপেনহাওয়ার, ফ্রেডরিখ হেগ্যেল, অগাস্ত ক্যোতে থেকে শুরু করে আজকের হাভার্ডের বিজ্ঞানীরা বই অবধি লিখেছেন। ইউরোপীয় এনলাইটমেন্টের গুরু ভলতেয়ার সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে নিগ্রোরা বাঁদর থেকে এসেছে নাকি বাঁদররা নিগ্রো থেকে এসেছে তা গবেষণার বিষয়।

অথচ সত্যি কথা এই যে, মানুষ যা কিছু নিয়ে গর্ববোধ করে - গায়ের রং, মেধা, বংশ-মর্যাদা, সৌভাগ্য, রূপ-লাবণ্য, শারীরিক গঠন- কোন কিছুই তার নিজের কামাই না, সবই জন্মসূত্রে মুফতে পাওয়া। আমি এই যে দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেই আমি আমার অস্তিত্বে আসার আগে আমার প্রাপ্ত দেহের কোন অংশের ব্যাপারেই কিছু করিনি। করার মত কোন বোধই তো ছিল না। আমার আমি আমার আত্মা, বিবেকবোধ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমেত - এই আমি, পুরোটা একটা সিঙ্গেল প্যাকেজ, পুরোটাই আল্লাহর দান। কোন বুদ্ধিমান মানুষ কি স্রষ্টা যা 'ভিক্ষা' দিলেন তা নিয়ে অহংকার করতে পারে? আমার যাতে কোন কৃতিত্ব নেই সেটা নিয়ে গর্ব করার কিইবা আছে?

আমি বাংলাদেশে জন্মেছি। কিন্তু আমি ডেনমার্কে জন্মে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান হতে পারতাম আবার নাইজেরিয়াতে জন্মে কালো মানুষও হতে পারতাম। আমার জন্মভূমি বা জাতিসত্তা নির্ধারণে আমার কোন হাত ছিল না - এটা পুরোপুরি স্রষ্টাপ্রদত্ত একটা ব্যাপার। আমার মনে পড়ে না যে আমি আল্লাহকে বলেছিলাম - আল্লাহ বাংলাদেশ জায়গাটা খুব সুন্দর ওখানে আমার জন্ম দিও। আল্লাহ যে আমাকে সাহারার শুকনো ধূধূ কোন মরুভূমিতে জন্ম দেননি, কিংবা কানাডার আলবার্টার বরফরাজ্যের অধিবাসী করে পাঠাননি সেজন্য আমি সত্যি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি বৃষ্টি আর পাহাড় দু'টি খুব ভালোবাসলেও আল্লাহ্ যে আমাকে আসামের চেরাপুঞ্জি বা হিমালয়ের কোন পাহাড়ি গ্রামে জন্ম দিয়ে পাঠাননি সেজন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। আমি তথাকথিত উন্নত বিশ্বের নাগরিক নই বলে আমার যেমন আক্ষেপ নেই, তেমনি মক্কায় জন্ম হলে বায়তুল্লাহতে প্রতি ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে ১ লক্ষ গুণ প্রতিদান পেতে পারতাম - সেটা নিয়েও আমার মনঃতাপ নেই।

কেন নেই? কারণ আমি জানি আল্লাহ আমার রব এবং তিনি যে আমাকে বাংলাদেশের যশোরে জন্ম দিয়েছেন, ঢাকায় বড় করে তুলেছেন তার পিছনে তার একটি উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্যটা আমি জানি না। কিন্তু তাঁর যে আমাকে নিয়ে একটি পরিকলনা আছে তা সুনিশ্চিত। আরেকটু বড় আঙ্গিকে দেখলে- এই সমগ্র বিশ্বচরাচর সৃষ্টি ও প্রতিপালনের মহাপরিকল্পনার আমিও একটা অংশ। আল্লাহ যাই করেন তার অসীম জ্ঞানের ভিত্তিতে যেটা ভালো বোঝেন সেটাই করেন। তার এই সাজিয়ে দেয়া প্রেক্ষাপটে আমার ভূমিকা- আল্লাহ

আমাকে যখন যে পরিস্থিতিতে ফেলবেন তখন আমাকে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ কিসে সন্তুষ্ট হবেন সেটা জানতে পারব আল কুরআন এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর ছহীহ সুন্নাহ থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু সূরা হুজুরাতে খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন- 'হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো'।

আল্লাহ আমাকে বাঙালি জাতিতে সৃষ্টি করেছেন যেন আমি অন্যান্য জাতির কাছে পরিচয় দিতে পারি। আল্লাহ জাতিভেদ এজন্য সৃষ্টি করেননি যেন আমি বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে অহংকার করতে পারি। একজন মানুষ ভারতে জন্মেছে দেখে তাকে আমি ভারতীয় হিসেবে অপছন্দ করব, আবার পাকিস্তানের নাগরিক দেখেই তাকে ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নেব - একারণে আল্লাহ একেকজনকে একেক জাতিসত্তা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাননি। মানুষের জন্মপরিচয়টা যে আল্লাহ্র কাছে গুরুত্ব রাখে না সেটা একই আয়াতের বাকি অংশে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন– 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে'।

মানুষকে তার জন্মের ভিত্তিতে ভাগ করা যাবে না, ভাগ করতে হবে তার কাজের ভিত্তিতে। আর কে কি করবে তা নির্ভর করে সে কি বিশ্বাস করে তার উপরে। যে বিশ্বাস করে আল্লাহ সব কিছু দেখছেন সে প্রবৃত্তির তাড়নায় মুহূর্তের অসতর্কতায় একটা পাপ করে ফেললেও আল্লাহ্র কাছে ফিরে আসে, ক্ষমা চায়। কিন্তু যে কুর'আনে বিশ্বাসী নয় সে গরীব মানুষকে উচ সুদে টাকা ধার দিয়ে ভাবে খুব ভাল কাজ করছি। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতি তাই দু'ভাগে বিভক্ত - বিশ্বাসী/ অবিশ্বাসী, যারা জানে/যারা জানে না, যারা মানে/যারা মানেনা, জান্নাতী/ জাহান্নামী।
একজন মুসলিম তার জাতীয়তাবাদ নিয়ে গর্ব করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিক্ষা দিলেন- মানুষ যেন তাদের মৃত পূর্বপুরুষকে নিয়ে গর্ব না করে। ... আল্লাহ অজ্ঞতার যুগের সাম্প্রদায়িকতা ও বংশগৌরব নিষিদ্ধ করেছেন। নিশ্চয় একজন মানুষ হয় সৎ বিশ্বাসী অথবা হতভাগ্য পাপাচারী। সমস্ত মানুষ আদমের সন্তান আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী।

আরবের শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম নেয়া মুহাম্মাদ (ছাঃ) আরব জাতীয়তাবাদ সহ অন্য যেকোন ধরনের জাতীয়তাবাদের মূলোৎপাটন করে গেছেন অনেক আগেই- অনারবদের উপর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আরবদের উপরেও অনারবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, নেই সাদার উপরে কালোদের অথবা কালোর উপরে সাদাদের। শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তাক্বওয়াতে।

তাক্বওয়া মানে আল্লাহকে ভয় করা, তার আনুগত্য করা। যে আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় পেয়ে যত বেশী খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে সে তত বেশী ভাল মানুষ। যে আল্লার পুরস্কারের আশায় যত বেশী ভাল কাজ করবে তার শ্রেষ্ঠত্ব তত বেশী।

অহংকার করা ইসলামে নিষিদ্ধ, যার অন্তরে অণুমাত্র অহমিকা থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বেতন নিয়ে গর্ব করলে গর্ব হয়, ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করলে গর্ব হয়, দেশ নিয়ে গর্ব করলে সেটা হয়ে যায় দেশপ্রেম? উন্নত জীবনের লোভে বিদেশে অভিবাসী হয়ে চোস্ত ইংরেজিতে "আই এম প্রাউড টু বি আ বাংলাদেশী" বললে দেশকে ভালোবাসা হয়, আর বিদ্যুৎ-বিভ্রাট, নিশ্চল রাজপথ আর আগুনে বাজার সহ্য করে দেশ ছেড়ে যাব না বলে মাটি কামড়ে থাকা দৃঢ়চিত্ত মুসলিম হয়ে যায় তালেবান, দেশদ্রোহী, রাজাকার। দলের নামের আগে "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী" ট্যাগ থাকলেই দুর্নীতি করে সম্পদের পাহাড় গড়া জায়েজ হয়ে যায়? দুর্নীতি করেছে তো কি হয়েছে, দেশকে তো ভালোবাসে। এ যেন সেই গ্রামীণ প্রবাদ - "লাথি মেরেছে তো কি হয়েছে, আমার গরুই তো মেরেছে।"

একজন মানুষ যখন অহংকার করে তখন সে শুধু আল্লাহ্র নয় মানুষেরও অপ্রিয়পাত্র হয়। একজন ধনী ব্যক্তি যদি কথায় কথায় তার সম্পদের বর্ণনা দেন সেটা কি শুনতে ভালো লাগে? ক্লাসের সামনের দিকের কেউ যখন বুঝিয়ে দেয় সে আমার চেয়ে ভাল ছাত্র তখন কি ভাল লাগে? ক্যাডার যখন শাসিয়ে যায় - 'আমার দল কিন্তু ক্ষমতায়' তখন? অস্ট্রেলিয়ায় যখন ভারতীয়দের পেটানো হয় তখন আমরা বলি রেসিস্ট। শ্বেতাঙ্গ চরমপন্থীরা অভিবাসীদের বের করে দিতে চাইলেও আমরা বলি যেনোফোবিক। অথচ আমরা যখন গাই - 'সকল দেশের সেরা ... সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি' তখন আমরা কি বোঝাতে চাই? নাকি আমরা যা বলি তা মিন করি না। আসলে মিন ঠিকই করি, ক্ষমতায় কুলায় না দেখে পেরে উঠিনা। যাদের সাথে পেরে উঠি - উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল কিংবা মধুপুরের গারো - তাদের জমি আমরা কেড়ে নেই, তাদের বাসভূমি-অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান নষ্ট করে গাছ কেটে বন উজাড় করে আমরা ঘুরতে যাবার পার্ক বানাই।|

জাতীয়তাবাদের পরিণাম–শত্রুতা, বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা। এতে বিভেদ বাড়তেই থাকে, কমে না। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দাবী করেও মানুষ বিভক্ত হয় এলাকাভিত্তিক ভেদাভেদিতে। সিলেটি, চাটগাঁইয়া, নোয়াখাইল্যা, ঢাকাইয়া, বরিশাইল্যা, রংপুরিয়া, চাঁপাইয়া- বিভেদের কি শেষ আছে? বিয়ের বাজারে একটা মেয়ের সব অর্জন তুচ্ছ হয়ে যায় তার 'দেশের বাড়ি'র কারণে। যোগ্যতা ভূলুণ্ঠিত হয় চাকরির প্রমোশনে, গুরুত্ব পায় 'এলাকার ছেলে'- এই পরিচয়। অথচ মদীনার আনছার আর মক্কার মুহাজিরদের ভিতরে জন্মস্থানভিত্তিক সামান্য কোন্দলটুকুও রাসূল (ছাঃ) সহ্য করেননি। তিনি বিভেদের শ্লোগানকে 'দুর্গন্ধময় অজ্ঞতার যুগের ডাক' হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন।

ইসলাম আমাদের শেখায় বন্ধুত্ব, ভালবাসা। চাইনিজ বা ওলন্দাজ, আফগান বা বিহারী, ককেশীয় বা নিগ্রো, ভারতীয় বা বাংলাদেশী, উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গ - যেই ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মেনে নিয়েছে সেই আমার ভাই। আমরা একে অপরের ব্যথায় কষ্ট পাই, সুখে সুখী হই, সে পৃথিবীর যে অংশেই থাকুক না কেন। কিন্তু আমার আপন ভাইও যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে মানে, রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) কে অগ্রাহ্য করে তবে আমি তার জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত নই। আমি জন্মসূত্রে বাঙালি, বিবেক সূত্রে মুসলিম - এভাবেই আমি জাতীয়তাকে বেছে নেই। বাংলাদেশের প্রতি আমি আমার কর্তব্য করে যাই, জন্মভূমি হিসেবে একে ভালোবেসে যাই কিন্তু আমি বাংলাদেশী বলে মিথ্যা গর্ব করি না। তবে আমি সুপথপ্রাপ্ত এই মর্মেও গর্ব করিনা, কারণ ব্যক্তি হিসেবে আমাকে আল্লাহ দয়া করে পথ দেখিয়েছেন, ইসলাম কি সেটা বুঝে-শুনে মানার সামর্থ্য দিয়েছেন। অন্তর্ভুক্ত করেছেন এমন এক জাতির যা দেশের সীমানা পেরিয়ে, কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে পুরো পৃথিবীর সর্বযুগের সকল সত্যসন্ধানী মানুষকে একত্রিত করেছে।

আল্লাহ আমাদের সেই সত্যসন্ধানী মানুষদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবার সামর্থ্য দিন। আমীন!

▪ ***লেখক:*** *মানারাত ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, ঢাকা।*

I could just live this world Altogether

Arif kabir

It was a beautiful moonlit, starless night. I gazed out of the window and breathed in deeply. It all seemed so peaceful, but yet, the turmoil within me seemed to be raging harder than ever. I had a sudden urge to jump and just let go. Let go of my worries, my problems, my life…
I'm **so** not worth anything.

Sometimes I feel like my family thinks I was only a nuisance…and I don't blame them. After all, they have to pay for my food, pay for my school, and pay for my clothes. I feel like my friends don't really like me, and I don't blame them either. After all, it's not like anything is really special about my personality…I'm so not worth anything. Why am I still on this Earth? I wish I could just end everyone's torment by disappearing. Yes, that would be enjoyable… disappearing to a land in the middle of the desert, or on an island in the middle of an ocean where I wouldn't be bothering anybody. Or I could just leave this world altogether…

I'm so **not** worth anything.

Things might have been better if I had not been born. My parents would have more to spend on themselves. My teachers would have one less person to scold. My classmates would have more time to spend laughing instead of rolling their eyes at me. My future wife would be just as happy or more with another man. Perhaps it would be better if I stopped intruding into others' lives altogether. Perhaps it would be better if I simply stopped living…

I'm **so** not worth anything.

Suddenly two hands enveloped my eyes from behind me, and a voice giggled and cried out, "Who is it?!" I wasn't amused. I shoved the hands away in annoyance. "Get away from me Sara. Go back to your room." It was my little sister, up to her usual antics. "But why, *Bhaiya* (brother)? You didn't spend any time with me the whole day!" "Sara, I told you once. Go away!"

She pouted her lips and stubbornly said, "No! I won't go until you come with me. Come on!" She began to tug at my arms, willing for me to come with her. I once more shoved her arms to the side and looked at her furiously. "Sara, get out. NOW!" I bellowed. I was incensed that she disturbed me while I was so deeply immersed in my thoughts. I continued to glare at her until she silently trudged out of the room.

"Little sisters, they're so annoying!" I fumed to no one in particular. I looked out of the window into the moonlit sky again, and once more began to immerse myself in my deep thoughts…

I began to imagine how everybody would react if they found my body dead tomorrow. Familiar faces floated through my memories as I tried to imagine their faces in shock, not able to comprehend that I was no longer alive. I felt tears slowly well up in my eyes, as I realized that those moments of sadness, if it even happened, would quickly become a distant memory. The whole world was bound to forget me within just a few days of my death. Sure, my parents would have something to discuss for a week or two, but as death quickly becomes a stale topic of conversation for everyone, they would quickly move on to more riveting and current topics. I would lie in my grave, completely forgotten by the community around me. I looked out at the starless sky, and wished that I could just end the torment.

I'm so **not** worth anything…

My trail of depression broke again as I felt a small card slipped into my hand. I turned around and saw my young sister again, but she now had tears rolling down from her little red, swollen eyes. She didn't dare look up at me, but looked down, gazing intently at the card that was now in my hand. Agitated, I sighed and slowly unfolded the card. Inside, in scrawly handwriting, it read:

"Dear *Bhaiya*, I'm sorry that I made you mad. Will you forgive me? – Sara."

Man, did I feel horrible. Snapped out of my selfishness, I decided to make it up to her. I picked her up, hugged her tightly, and then began to tickle her neck, which always makes her explode into laughter. Her eyes brightened, and she began to smile wide once more. I let her down, and told her

quietly, "Sorry for not being nice to you before. I'm not mad at you. I'm just… not feeling well today. Okay?" She looked up, concerned, and asked softly, "*Bhaiya*, are you upset? *Amma* (mother) said to remember that Allah loves us when we get upset. I think that will make you more happy."

I managed to give her a weak smile and said, "Yeah, thank you, Sara… Now you go along and play. I'll spend time with you tomorrow when I feel better, promise." She beamed as she heard this and traipsed out of the room, already lost in another innocent world. I smiled as I watched her leave the room, and then turned back to the window, willing myself to return to my deep, dark thoughts.

Alas, it was to no avail. Her words, "Allah loves you," was like a fresh breath of air that cleared my stressed mind of all those heavy thoughts. I whispered the statement over and over, trying to connect the meaning. Allah loves you. Allah loves you? Allah loves me? *SubhanAllah* (glory be to Allah), I had totally forgotten to remember Allah in my thoughts! My family, friends, teachers, and relatives had all readily come to mind, but I had forgotten the most important source, my Creator.

I remembered a book that my mother had recently given to me as a gift entitled, "Remember Allah and He will remember you" and quickly picked it out from my bookshelf and read through it. As I began to sift through the pages, reminders kept hitting me: "Your friend is only Allah, His Messenger, and those who believe: those who perform prayer, give alms, and bow [in prayer]." (Qur'an, 5:55). *Subhan'Allah*, I reflected: Allah is directly telling every single one of us that He is always our friend and supporter.

I am somebody. I am of the Ummah of Muhammad (SM). I am of the religion of Allah.

As I continued on reading the book, I couldn't stop uttering, "*Subhan'Allah.*" I froze when I came across the following words:

"If Allah loves a person, He calls Jibreel saying, 'Allah loves so and so; Oh Jibreel, love him. And make an announcement amongst the inhabitants of the heaven, Allah loves so and so therefore you should love him also', and so all the inhabitants of the heaven would love him, and then he is granted (all) the pleasures of the people on the earth." (Bukhari and Muslim)

Oh Allah! What more could I ever want?! My own Lord mentioning my name – uttering Himself that He loves me! Not only that, but the people in Heaven *and* Earth will even love me because of Allah? What more could I ever want? Tears began to swell in my eyes as I began to imagine the righteous scholars of the past that must have earned and deserved this high honor. I began to desperately wish and pray that I would be included amongst these people too. I wanted to be worth Allah's love.

I am somebody. I am a Muslim, a believer and servant of Allah, *al-Wadood*, the Loving.

"Allah said, 'O son of Adam! If you mention Me to yourself, I will mention you to Myself. If you mention Me in a gathering, I will mention you in a gathering of the angels (or in a better gathering). If you draw closer to Me by a hand span, I will draw closer to you by forearm's length. If you draw closer to Me by a forearm's length, I will draw closer to you by an arm's length. And if you come to Me walking, I will come to you running" (Bukhari)

I had to lift myself out of feeling worthless. I looked upwards, "Oh Allah, I am turning to You. I had to value my existence because Allah valued me; Oh Allah, please forgive all of my previous sins and allow me to earn Your Pleasure. Oh Allah…"

My dark thoughts tried rushing back into my mind, but they no longer carried the impact and weight as before. It's true that my heart had lulled with thoughts of depression and suicide, but I realized that this was from *Shaytan.* He wanted to convince me that I was nobody and so not worth anything. However, I now realize that Allah has given me worth and set a bar to reach, to attain His love. And even when I see that I am truly nobody in this world, it means that I have nothing to lose and everything to give to all those around me. I am at a low point because now I can aim higher.

Let my "friends" laugh at me. Let my teachers sigh at me. Let the world disbelieve in me.

I won't mind as long as I have Allah to depend on.

I am never forgotten if I remember Allah.

I am somebody.

I am a Muslim and I don't walk alone.
I fear no one except the One Above The Throne.

বীজগণিতের জনক আল-খাওয়ারযিমী

-শাহাদাত হুসাইন

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামের মূল দুই সূত্র পবিত্র কুরআন ও হাদীছকে যতদিন মুসলিমরা আঁকড়ে ধরেছিল, ততদিন তাদের মর্যাদা পৃথিবীর বুকে সমুজ্জ্বল ছিল। কিন্তু কুরআন ও হাদীছকে ভুলে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের সেই মর্যাদা ও দাপটও ধীরে ধীরে ক্ষীয়মান হয়েছে। আজ তাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামের মতো উৎসাহ আর কোন ধর্মই দেয়নি। আল্লাহ বলেন, 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন *(আলাক্ব ১)*। সূরা ইয়াসীনের ২ নং আয়াতে প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম খাওয়া হয়েছে। এছাড়া কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-গবেষণা, এমনকি সত্যতার যাচাই করতেও বলা হয়েছে। ইসলামে পৃথিবীর নানা স্থান ভ্রমণ করে আল্লাহ্র নিদর্শন দেখার ও তা নিয়ে চিন্তা করার নির্দেশ এসেছে। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দো'আ করতে বলেছেন এভাবে, 'হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন' *(ত্ব-হা ১১৪)*। হাদীছে প্রত্যেক নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করাকে ফরয বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৮, সনদ হাসান)*। এছাড়া হাদীছে এসেছে, আল্লাহ যার জন্য কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন *(মুত্তাফাক্ব আলাহই, মিশকাত হা/২০০)।* এটা আল্লাহ্র নেআমত ।

আজ মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা থেকে পিছিয়ে আসার ফলে সে শূন্যস্থান দখল করে সামনে এগিয়ে এসেছে ইহুদী-খৃষ্টানরা। যার বলে তারা বিপুল শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে সারাবিশ্বকে আজ শাসন করছে। অথচ পাশ্চাত্যের এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাগ্রসরতার পিছনে রয়েছে মুসলিম বিজ্ঞানীদের বিশাল অবদান। পরিতাপের বিষয় আমরা মুসলিম হিসাবে দাবী করলেও আমরা আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অতীত ঐতিহ্যকে যেমন হারিয়েছি, তেমনি ঐসকল মুসলিম বিজ্ঞানীদেরও ভুলতে বসেছি যারা ছিলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার মূল কারিগর। ফলে দেখা যায়, বীজগণিতের জনক আল-খাওয়ারযিমী, রসায়নের জনক জাবির ইবনে হাইয়্যান, চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ইবনে সীনার মত খ্যাতনামা মুসলিম পণ্ডিতদের নাম আমাদের প্রজন্মের মুসলিম সন্তানরা প্রায় জানেই না। নিম্নে গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ অবদান রাখা মধ্যএশিয়ার মুসলিম বিজ্ঞানী আল-খাওয়ারযিমীর পরিচয় ও বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে তাঁর অবদান আলোচনা করা হল।

নাম ও পরিচয় : নাম আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মাদ। পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে মূসা আল-খাওয়ারযিমী।

জন্ম : সোভিয়েত রাশিয়ার আরব সাগরে পতিত আমু দরিয়ার নিকটে একটি দ্বীপের নিকটে অবস্থিত খাওয়ারযিম নামক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এর অবস্থান ছিল পারস্যের অন্তর্গত খিভা প্রদেশে। তাঁর বাল্যকাল ও কৈশোর সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে আনুমানিক ৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

জীবন ইতিহাস : খ্যাতনামা মুসলিম বিজ্ঞানী আল-খাওয়ারযিমী ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল অতীতে যে সকল মনীষী মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে অগ্রগণ্য। আব্বাসীয় খলীফা আল-মামূনের রাজত্বকালে খ্যাতির শীর্ষে আরোহনকারী বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তিনি খলীফা আল-মামূনের বিখ্যাত গবেষণাগার 'বায়তুল হিকমাহ' সংলগ্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হিসাবে চাকুরী করতেন। তিনি খলীফা আল-মামূনের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন এবং পরবর্তী খলীফা আল-ওয়াতহিক-এর শাসনকালের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি পাটীগণিত, বীজগণিত, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ে অবদান রাখেন। তবে মূলতঃ বীজগণিতের জন্যই তিনি সবচেয়ে আলোচিত হন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আত-তাবারী তাঁর নাম দেন মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-খাওয়ারযিমীআল-কুতরুবুল্লী। আল-কুতরুবুল্লী বিশেষণ এটাই নির্দেশ করে যে, তিনি সম্ভবতঃ বাগদাদের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র শহর কুতরুবুল হতে এসেছিলেন। আল-তাবারী তাঁকে মাজুসীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি হয়তোবা প্রাচীন জরথুস্ট মতবাদের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর আল-জাবর ওয়াল মুকাবিলা বই থেকে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, হয়তোবা তাঁর পূর্বপুরুষ বা সম্ভবতঃ তিনিও কৈশোরে জরথুস্ট মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।

বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ : খলীফা মামূনের বিশাল লাইব্রেরীতে আল-খাওয়ারযিমী চাকুরী গ্রহণ করেন। এখানেই সম্ভবতঃ তিনি বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। অসীম ধৈর্য সহকারে অধ্যয়ন করে তিনি বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন।

আল-খাওয়ারযিমীর অবদান : তিনি ছিলেন একজন জগতবিখ্যাত গণিতবিদ। তাঁর সময়ের গণিতের জ্ঞানকে তিনি এক অভাবনীয় সমৃদ্ধতর পর্যায়ে নিয়ে তুলেন। একজন গণিতবিদ হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদ। ভূগোল বিষয়ে তাঁর প্রজ্ঞা ছিল অসাধারণ।

তিনি ছিলেন বীজগণিত তথা এলজাবরার জনক। তিনি প্রথম তার একটি বইয়ে এই এলজাবরার নাম উল্লেখ করেন। বইটির নাম হল "আল-জাবর ওয়া আল-মুকাবিলা"। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রিক ও ভারতীয় গ্রন্থও আরবীতে অনুবাদ করেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান নিম্নে উল্লেখ করা হল :

পাটিগণিত-এর ক্ষেত্রে অবদান : পাটিগণিত বিষয়ে তিনি একটি বই রচনা করেন যা পরে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে হিন্দুগণিতবিদগণ দশমিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিকে খাওয়ারযিমীই প্রথম ইসলামী জগতে নিয়ে আসেন। তাঁর রচিত The Book of Addition and Substraction According to

Contents

the Hindu Calculation (যোগ-বিয়োগের ভারতীয় পদ্ধতি) তারই উদাহরণ।

বীজগণিত-এর ক্ষেত্রে অবদান : এ ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে বেশী উৎকর্ষতা লাভ করেন। তার হাতেই গণিতের এই শাখাটি পরবর্তী সময়ে আরও সমৃদ্ধতর হয়। বর্তমান যুগ পর্যন্ত গণিত বিদ্যায় যে উন্নয়ন এবং এর সহায়তায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে উন্নতি ও আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে তার মূলে রয়েছে আল-খাওয়ারযিমী'র উদ্ভাবিত গণিত বিষয়ক নীতিমালারই বেশী অবদান।

তার রচিত বই 'কিতাব আলজিবন ওয়াল মুকাবিলা' হতে বীজগণিতের ইংরেজী নাম অ্যালজেবরা (Algebra) উৎপত্তি লাভ করে। Algorithm শব্দটি Alkhwarizmi নামের ল্যাটিন AcŠsk algorismi হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। এলজাবরায় লিনিয়ার বা একঘাত এবং কোয়াড্রেটিক বা দ্বিঘাত সমীকরণ আছে।

আমরা সাধারণত কোন সমীকরণ সমাধান করে যখন x অথবা y-এর একটি করে মান পাই। যেগুলো এক ঘাত সমীকরণ নামে পরিচিত। আবার দ্বিঘাত সমীকরণে দু'টি মান পাওয়া যায়। এই দুই ধরনের সমীকরণের বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখা তুলে ধরেন আল-খাওয়ারযিমী।

যেমন এটি একটি একঘাত সমীকরণ যার একটি মান ১। আবার একটি দ্বিঘাত সমীকরণ যেখানে এর মান দু'টি অথবা।

তার এলজাবরা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে গণিত জগতে এর উপযোগিতা অভাবনীয় বেড়ে যায়। মধ্যযুগের আর কোন গণিতবিদই গণিত জগতে তার সমান্তরাল কর্ম উপস্থাপন করে যেতে পারেননি। তিনি গণিতের লগারিদম শাখাটিও তিনি উন্নয়ন করেন।

গণিতে শূণ্যের ব্যবহার : যদিও এটি গণিতের অন্তর্ভুক্ত তবুও এর গুরুত্ব বিবেচনা করে এটি আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হল। গ্রীক ও ভারতীয় হিন্দু গণিতবিদদের মধ্যে গণিতের যে অসম্পূর্ণতা ছিল, সে অসম্পূর্ণতা দূর করেছিলেন আল-খাওয়ারযিমী। তাঁর গণিতের উপস্থাপনা ছিল অসাধারণ ও অনন্য। আরবীয়রা ভারতীয়দের নিকট থেকে সংখ্যা লিখন প্রণালী শিক্ষা লাভ করেন। মুসলমান বৈজ্ঞানিকেরা পরে এটিকে সংশোধন করেন এবং শূন্য লিখন প্রণালী উদ্ভাবন করেন। খাওয়ারযিমী এ শূন্য লিখন প্রণালীকে সর্বশেষ রূপদান করেন। ইউরোপীয়রা মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করেন। এই শূন্য ব্যবহার করার ফলে গণিত এসে দাঁড়াল পরিপূর্ণ প্রেক্ষিতে। এই শূন্য ব্যবহার গণিতে নিয়ে আসল এক অসাধারণ বিপ্লব।

ভগ্নাংশ পদ্ধতি আবিষ্কার : ভারতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার সময়ে তিনি আবিষ্কার করেন ভগ্নাংশের বিস্ময়কর দিক। তার এই কাজগুলো পরিচিত ছিল আরব্য-কর্ম হিসাবে। শিগগিরই তাঁর কর্ম-অবদানগুলো পৌঁছে গেলো ইউরোপে। ইউরোপীয়রা দ্রুত তার বই ও লেখাগুলো অনুবাদ করে নেয়। সেই সাথে তিনি ইউরোপেও বিখ্যাত হয়ে যান। তিনি দশমিক ব্যবস্থাকে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিতে চাইলেন। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান প্রশংসনীয়।

ত্রিকোণমিতিতে অবদান : গণিতের আরেকটি শাখা হল ত্রিকোণমিতি। সমকোণী ত্রিভুজের তিন কোণ আর বাহু নিয়ে ত্রিকাণমিতির কারবার। আল-খাওয়ারযিমী উদ্ভাবন করেন ত্রিকোণমিতির বিস্তারিত উপাত্ত। তিনিই কনিক সেকশনের গাণিতিক ধরনের আধুনিকায়ন করেন। এরপর তিনি হাত বাড়িয়ে দেন ক্যালকুলাসে। তিনি ক্যালকুলাসের উন্নয়ন ঘটি-এর আধুনিকায়ন করেন। ডিফারেনিয়াল ক্যালকুলাস হচ্ছে এর একটি শাখা। এটি নিয়ে তিনি কাজ করা শুরু করেছিলেন।

জ্যামিতিতে তাঁর অবদান : তিনি প্রথম বীজগণিতের সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধান নির্ণয় করেন। জ্যামিতির ক্ষেত্রে আয়ত, বর্গ, ত্রিভুজ প্রভৃতি জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলোর যে ধারণা দিয়েছিলেন তা হুবহু আজও একই রকম রয়েছে। তিনিই কনিক সেকশনের গাণিতিক ধরনের আধুনিকায়ন করেন।

জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অবদান : জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য এবং দিয়ে গেছেন নতুন ধারণা ও প্রজ্ঞার জগতে। তাঁর আরও কাজের মধ্যে ঘড়ি ও সূর্যঘড়ির ক্ষেত্রে অবদান অন্তর্ভুক্ত। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের একখানা জিজ বা তালিকা প্রণয়ন করেন। তাঁর এই জিজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, এতে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঔপপত্তিক উপক্রমণিকা সংযোগ করেন। এ বিষয়ে এ উপক্রমণিকাই তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর। এ সম্পর্কিত তাঁর দুই খানা গ্রন্থ রয়েছে। প্রথম গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতির নির্মাণ কৌশল আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কিরূপে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ নিতে হয় তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাগুলো অনুবাদ করা হয় ইউরোপীয় ভাষায়। পরবর্তীতে এগুলো চীনা ভাষাতেও অনুবাদ করা হয়।

অনুবাদ কর্মে তাঁর অবদান : এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি গ্রীক ও ভারতীয়দের বইগুলো আরবীতে অনুবাদ করেন। তিনি টলেমীর বইগুলো অনুবাদ করেন। এছাড়া তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর একটি বই অনুবাদ করেন ।

ভূগোল শাস্ত্রে অবদান : তিনি টলেমী সুচিত অনেক ভৌগলিক ধারণার সংশোধন করেন। ইউরোপীয়রা এতে বিস্মিত হয়। টলেমির মানচিত্র পর্যন্ত তিনি সংশোধন করেন এবং তাতে একটি মানচিত্র সংযুক্ত করেন। তিনি টলেমির দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা গ্রহণ করেন, সেই সাথে তাতে মুসলিম দেশগুলোর বিবরণ পেশ করেন। তাঁর উদ্যোগে পৃথিবীর একটি বাস্তবরূপ তৈরী করা হয়, যা পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কনে নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিনি সর্বপ্রথম পৃথিবীকে সপ্ত ইকলিম বা মণ্ডলে ভাগ করেন এবং এই সূত্র ধরে আবহাওয়ার পরিমণ্ডল অনুসারে পৃথিবীকে সাতটি মহাদেশে ভাগ করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর রচিত ভারতীয়দের একটি বই "সিদ্ধান্ত" তিনি আরবীতে অনুবাদ করেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থ :

তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। এগুলোর অধিকাংশ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আবার অনেকগুলোর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

আল-জাবর ওয়া আল-মুকাবিলা : এ বইটি তাঁর সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। এটি সবচেয়ে বেশী বিখ্যাত। এই বইটির নাম অনুসারে এলজেবরা বা বীজগণিত নামকরণ করা হয়। এ বইটি লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় দ্বাদশ শতকে। অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে এই নতুন বিজ্ঞান পশ্চিমা জগতে প্রবেশের সুযোগ পায়। এর আগে ইউরোপের কাছে বীজগণিত ছিল একটি অচেনা বিষয়। ইউরোপীয়রা এ বিষয়ে ছিল পুরোপুরি অজ্ঞ। এক বইটি পাঁচখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম অংশে তিনি দ্বিঘাত সমীকরণগুলোকে ছয়ভাগে বিভক্ত করে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে

আলোচনা করেন। দ্বিঘাত সমীকরণে যে দু'টো মূল বিষয় তা খারেজমী সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন এবং এটি সমাধান করেন। দ্বিতীয় অংশে তিনি বীজগণিতের সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধান নির্ণয় করেন। চতুর্থ খণ্ডে তিনি করণী অপসারণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দশম শতাব্দীর ইউসূফ রচিত মাফাতিহুল উলূম গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়।

কিতাবুছ ছুরত আল-আরয : এটি ভূগোল বিষয়ক বই। এটি পৃথিবীর আকার সমন্ধীয় একখান বই। তাঁর এ গ্রন্থখানা মূলতঃ ভূগোল সমন্ধীয় আলোচনায় সমৃদ্ধ। এটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অনুবাদকর্মের সাথে মানচিত্রগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কিতাব আল-জামা' ওয়াত তাফরিক-বিল হিসাব আল-হিন্দী : এই বইটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কিন্তু এই বইটি আরবীতে আর পাওয়া যায় না।

ইসতিখেরাজ তারিখ আল-ইয়াহুদ : ইহুদী পঞ্জিকা নিয়ে তিনি এই বইটি রচনা করেন।

কিতাব আল-তারিখ : এ মুল্যবান বইটির পাণ্ডুলিপি আর পাওয়া যায় না। এটি সাধারণ দিনলিপির উপর লিখিত।

কিতাব আল-রুখমাত: এটি সূর্যঘড়ির উপর লিখিত একটি বই। এটিরও হদীস আর পাওয়া যায় না।

মৃত্যু : সম্ভবত এ মহান বৈজ্ঞানিক ৮৪৭ বা ৮৪০ খৃষ্টাব্দের দিকে মৃত্যুমুখে পতিত হন। খলীফা মামূনের মৃত্যুর পরও তিনি এক যুগের অধিক জীবিত ছিলেন।

বিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের জন্য আল-খাওয়ারযিমী চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ষোড়শ শতক পর্যন্ত তার অনেক বই ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। জ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহই তাকে একজন পুরোপুরি বিজ্ঞানীতে পরিণত করে তুলেছিল। তাঁর গবেষণা বিজ্ঞানীদের সমসাময়িক অনেক বাধা দূর করে। আজও তিনি আপন কীর্তিতে সমুজ্জ্বল। আসুন আমরাও কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণ করার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্বেষণ করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন!

তথ্যসূত্র :

১. মনীর তৌসিফ, যেসব মুসলিম মনিষী বদলে দিয়েছেন পৃথিবী (সূচীপত্র প্রকাশনী)।
২. এম শফীউল্লাহ, সেরা ক'জন মুসলিম বিজ্ঞানী (ঐতিহ্য প্রকাশনী)।

▪ ***লেখক:*** *কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইলেক্ট্রোনিক্স বিভাগ, রুয়েট।*

নিসর্গের প্রাণোচ্ছলতায়, বৈচিত্র্যের সমারোহে

আসিফ রেজা

মানসিক প্রস্তুতি চলছিল বেশ কয়েকমাস পূর্ব থেকেই। আর সময় যতই ঘনিয়ে আসছিল পাল্লা দিয়ে জল্পনা-কল্পনার ঝাঁপি ততই সমৃদ্ধ হচ্ছিল। আর কেনই বা হবে না! এবারের শিক্ষাসফর যে বাংলাদেশে ইসলামের প্রবেশদ্বার খ্যাত, বিপুল সৌন্দর্যের রাণী, দেশের একমাত্র শিল্পনগরী চট্টগ্রামে! প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' থেকে গত বছর আয়োজিত শিক্ষাসফরে স্বপ্নভূমি সিলেট ভ্রমণের পর সকলেরই সুপ্ত বাসনা ছিল কল্পনারাজ্য চট্টগ্রাম ভ্রমণের। ফলে এবারের শিক্ষাসফরের স্থান হিসাবে চট্টগ্রাম নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে ভ্রমণেচ্ছুদের গহীন মন বৃক্ষে যেন বসন্তের নব পল্লবের আলোড়ন শুরু হল।

যাত্রা : প্রতীক্ষার প্রহর পেরিয়ে যাবতীয় প্রস্তুতির পর্ব সেরে অবশেষে ০৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১ রোজ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮-টায় মারকায প্রাঙ্গন থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হল; গন্তব্য- চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ও স্বপ্নের সেন্টমার্টিন। যাত্রার পূর্বক্ষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বাণী ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। সফরে আমীর হিসেবে ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমান ও তাঁর সহযোগী ছিলেন সহকারী শিক্ষক ইমামুদ্দীন। ৪৯ জন ছাত্রসহ মোট ৫৫ জনের একটি দল রওনা হলাম ভিন্ন রকম এক শিক্ষার্জনের নেশায়।

দৃষ্টিভ্রম : বেলা ৮-টার দিকে চট্টগ্রামে প্রবেশ করলাম। এর আগে কুমিল্লায় যাত্রা বিরতি হয়েছিল ফজরে ছালাতের জন্য। চারিদিকে ঊষার আগমনবার্তা যেন কুয়াশার চাদর থেকে বেরিয়ে কর্মচাঞ্চল্যের প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রভাত রবির মিষ্টি ছটায় শিশিরবিন্দু বর্ণিল রঙে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ পর এই খেলা আর থাকবে না। কর্তব্যপ্রাণ সূর্যিমামার কর্মমুখর দিন যতই অগ্রসর হবে শিশিরবিন্দুর খেলা ততই শেষ হয়ে আসবে। একমনে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে হঠাৎ দৃষ্টিভ্রম। পূর্ব দিগন্তে সারি সারি ওগুলো কি? দিগন্ত বিস্তৃত কালো মেঘ? রৌদ্রোজ্জ্বল শীতের সকালে হঠাৎ এমন মেঘের ঘনঘটা? তাহলে কি খানিক বাদে এক পসলা বৃষ্টি নামবে? কিছুটা এগিয়ে দৃষ্টির সামনে থেকে গাছপালা সরে যেতে ভ্রমদৃষ্টির অবসান হল। ওগুলো কি মেঘ না পাহাড়! অস্ফুট কণ্ঠে..ঐ যে পাহাড়! বলার সাথে সাথে সবার চোখে মুখে আনন্দের দ্যুতি খেলে গেল। চৈত্রের খরতাপ-দগ্ধ শস্য বৈশাখের প্রথম বৃষ্টির ছোয়ায় ভেজা শীতল সমীরণে যেমন মুখর হয়ে দোলে, তেমনি সবার মন হর্ষোল্লাসে নেচে উঠল। গাড়ি চলছে আপন গতিতে, সেদিকে কারো কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। কখনো পাহাড় সম্পর্কে পাশের জনের সাথে মত বিনিময়, কখনো এক নিমেষে চেয়ে থাকা। এরূপ করতে করতে প্রায় আধা ঘণ্টা যাবৎ চলল পাহাড় দর্শন। অবশেষে সবাই একে একে আপন সিটে বসে পড়ল। সীতাকুণ্ডের ২/৩ শত ফুট উচ্চতার এই পর্বতমালা দৈর্ঘ্যে ২০ কিলোমিটারের কম হবে না।

পতেঙ্গা সৈকতে কিছুক্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগে প্রবেশের পর সবার কামনা একটাই- সমুদ্র সৈকত। ফলে কারো আর তর সইছিল না। চট্টগ্রাম শহরে ঢুকে চলন্ত বাসেই নাস্তা সেরে নিলাম। দীর্ঘ অপেক্ষার প্রহরশেষে যখন পতেঙ্গা সৈকতে গাড়ি পৌঁছল, তখন বেলা ১১-টা। এর আগে চট্টগ্রাম যেলা আন্দোলনের সভাপতি জনাব শামীম আহমাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি পথিমধ্যে আমাদের সঙ্গী হন। গাড়ি থামার পর আমাদের শিক্ষক জনাব ইমামুদ্দীন ছাত্রদেরকে সাগরে গোসল করার নিয়ম বলে দিলেন এবং সকলকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিলেন। সৈকতপানে ছুটলাম সবাই। পতেঙ্গা সৈকতে আমাদের পদ্মা নদীর পাড়ের মতই বড় বড় কংক্রিটের ব্লক ফেলে রাখা হয়েছে। এলোমেলো এসব কংক্রিট, পাথর পেরিয়ে সমুদ্রে নামা বেশ কষ্টকর। তখন ছিল জোয়ারের সময়। বেশ বাতাস। তর সইছিল না। গা ভাসালাম অথৈই জলধির বুকে বিসমিল্লাহ বলে। জোয়ারের সময় হওয়ায় পানি ছিল ঘোলাটে। তবে শীতের মধ্যে এই ঠাণ্ডাপানিতে বেশিক্ষণ গোসল করা সম্ভব হল না। গোসল সেরে ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। জুম'আর দিন। সৈকতের পাশেই দুপুরের রান্না হল। কিন্তু দেরী হয়ে যাওয়ায় খাবার সাথে নিয়ে আমরা ঝাউতলার খুলশী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। চট্টগ্রাম শহরের এই একমাত্র আহলেহাদীছ মসজিদটি বেশ পুরানো মনে হল। স্থানীয় কিছু আহলেহাদীছ এ মসজিদ তৈরী করেছিলেন। সেখানে পৌঁছে দেখি জামা'আত শেষ হয়ে গেছে। স্থানীয় মুছল্লীদের সাথে শামীম ভাই আমাদের পরিচয় করে দিলেন। পরিচয়পর্ব শেষে তিনিসহ সকলে দ্বিতল মসজিদ প্রাঙ্গনের ছায়াবীথিকার নীচে দুপুরের খাবার সারলাম। অতঃপর সেখানে যোহর ও আছরের ছালাত জমা করে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য বায়েজিদ বোস্তামীর মাযারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

শিরকের অভায়শ্রম!! : বাংলাদেশের মানুষ অগণিত ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। বিশেষতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষ শিরক-বিদ'আতের সাথে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। এ দেশের প্রতিটি মাযারই শিরকের আড্ডাখানা। চট্টগ্রামের এই তথাকথিত বায়েজিদ বোস্তামীর মাযার, যার অন্যতম। আমরা যখন মাযার গেইটে পৌঁছলাম, তখন প্রায় ৪-টা বাজে। মাযার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলাম। প্রবেশপথের বাম পাশে মাঝারী আয়তনের পুকুর, ডান পাশে মাযার। মূল মাযার তথা বায়েজিদ বোস্তামীর কথিত কবর সমতল ভূমি থেকে ৩০-৩৫ ফুট উঁচু টিলায় অবস্থিত। সেখানে ওঠা-নামার জন্য মাত্র দু'হাত প্রশস্ত একটি সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে কয়েক ধাপ গেলেই মাযার কক্ষ। সে কক্ষের মধ্যে রয়েছে কবর। তার পার্শ্বে আরেকটি কক্ষ রয়েছে মহিলাদের জন্য এবং সেখান থেকে কবর দেখার জন্য একটি বড় জানালা আছে। কবর তো নয়, যেন ছোট খাটো একটা গম্বুজ! নকশা করা দামী কালো কাপড় দিয়ে কবর ঢাকা। সেখানে কারুকার্য ও আলোকসজ্জার কোন কমতি নেই। স্টেইনলেস স্টীল পাইপের নকশা করা রেলিং দিয়ে কবর ঘেরা ও তার এক পাশে বহু কুরআন মাজীদ রাখা। অনেকে কবরের আশে পাশে কুরআন তেলাওয়াত করছে অধিক নেকীর আশায়। কেউ হাত তুলে নীরবে মুনাজাত করছে। কেউ আবার ছালাত আদায় করছে *(নাঊযুবিল্লাহ্)*। মনে মনে ভাবলাম। হায় কুরআন!! এরা না বুঝে পাঠ করে যাচ্ছে কবিতা পাঠের মত। আর কুরআনের সরাসরি বিপরীত কাজই তারা করে যাচ্ছে। কুরআন পাঠ করাই সার তাদের জন্য; এর মর্মবাণী

তাদের কণ্ঠনালীও অতিক্রম করছে না। আফসোস! শত আফসোস!! কে বোঝাবে এই নির্বোধ, অজ্ঞ, পথভ্রষ্ট মানুষগুলোকে! কবরের সামনে অসংখ্য মালাধারী এক বৃদ্ধ ভক্তি ভরে আগত দো'আপ্রার্থীদের মাথায় হিন্দু ঠাকুরদের ভক্তের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করার মত করে ময়ূর পালকের ঝাড়ু দিয়ে ঝেড়ে দিচ্ছে। তাতেই অজ্ঞ মানুষের দল তৃপ্ত অন্তরে ফিরে যাচ্ছে। কবর কক্ষের বা পাশে বেশ কয়েকটি বাঁধাই করা কবর এবং তার পার্শ্বে পাতাহীন ডালবিশিষ্ট তিনটি মরা গাছ। সেই বৃক্ষত্রয়ে কিছু নারী পুরুষ আপন আপন আশা-আকাঙ্খা পূরণার্থে লাল সুতা বাঁধছে। তন্মধ্যে নারীদের সংখ্যা বেশী। কি উদ্ভট তাদের বিশ্বাস! সেই গাছগুলোর পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে রয়েছে আরো পীর-দরবেশের কবর। কেউ কেউ তাদের নিকট থেকে দোআ নিচ্ছে এবং বিনিময় হিসাবে তাদেরকে টাকা-পয়সা প্রদান করছে। রাস্তার শেষপ্রান্তে দেখলাম আরেক কাণ্ড। ৭/৮টি প্রাচীর ঘেরা কবর। সেখানে ভক্তরা আতর গোলাপজল ছিটাচ্ছে, আগরবাতি-মোমবাতি জ্বালাচ্ছে, কবরের উপর টাকা-পয়সা ফেলছে, মুনাজাত করছে ইত্যাদি। সবচেয়ে কষ্টদায়ক যে বিষয়টি দেখলাম তা হল কয়েকজন মহিলা রেলিং-এ কপাল ঠুকছে। সেখানে এক খাদেম কে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই এই স্থানের ফায়দা কি? তার উত্তর ছিল- 'এখানে যদি কিছু ফায়দাই না থাকতো তাহলে এত মানুষ আসত না। এটা অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রের মতই হত। আর এখানে যত কচ্ছপ আছে অন্য কোথাও এত কচ্ছপ দেখতে পাবে না।' অপ্রাসঙ্গিক উত্তর পেয়ে তার সাথে তর্কে গেলাম না। ব্যথিত হৃদয় নিয়ে ওখান থেকে পুকুরের দিকে আসলাম। সিড়িঁবাঁধা ঘাটে শত শত নারী-পুরুষ পর্দা-পুশিদার কোন বালাই নেই। এ যেন এক মেলা। পুকুরে অনেক কচ্ছপ আছে, যেগুলোকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে মনে করা হয়। কচ্ছপকে খাওয়ানোর জন্য অনেকেই কলা, পাউরুটি, বিস্কুট, গোশতের টুকরা পানিতে ফেলছে। সেগুলো খাওয়ার জন্য পানির কিনারে আসলে ভক্তরা অনেক ভক্তির সাথে সেগুলোর গায়ে হাত বুলাচ্ছে, পরিস্কার করে দিচ্ছে। পুকুরের নোংরা পানিতে অনেকে ওযু করছে, কেউ আবার রোগমুক্তির আশায় পানও করছে। বিস্মিত হলাম এই দেখে যে, হিন্দুরাও এসব করছে। ভাবতে শরীর শিউরে ওঠে, তাদের এই কর্মকাণ্ড সবই যে শিরকের পর্যায়ভুক্ত! মনটা আবার ভিজে উঠল– হে আল্লাহ! তুমি এসব পথভ্রষ্টদের সঠিক পথের দিশা দাও- আমীন!!

চট্টগ্রাম থেকে বিদায় : বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে মাযার থেকে বেরিয়ে চললাম শহীদ জিয়া স্মৃতি কমপ্লেক্স দেখতে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম চট্টগ্রামের দক্ষিণের থানা সাতকানিয়ার পানে। পথিমধ্যে কর্ণফুলি নদী এবং তার উপর পাঁচ খুটি বিশিষ্ট অনন্য প্রকৌশল শৈলীতে নির্মিত 'শাহ আমানত' সেতুর পশ্চিম পার্শ্বে ১০০ মিটার দূরে আরেকটি রেলসেতু। তখন ছিল পড়ন্ত বিকেলের শেষ প্রহর। প্রভাকর তার খরোজ্জ্বল্য হারিয়ে আবীর রাঙা পোষাকে আসন্ন আঁধারের আগমনবার্তার জানান দিচ্ছিল। পরিবেশ জনমুখর হলে উপভোগ্যই ছিল। হেঁটেই সেতু পার হলাম। শত শত মানুষ আমাদের মত ভ্রমণে এসেছে। সবাই চলছে আপন গন্তব্যে। ধীরে ধীরে রবি পশ্চিম দিকে মুখ লুকালো। ব্রীজ পার হওয়ার পর শামীম ছাহেব আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমরা যাত্রা শুরু করি সাতকানিয়ার উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছলাম রাত্রি আটটায়। সেখানে আমাদের স্বাগত জানান সাতকানিয়া এলাকা আহলেহাদীছ আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা মোর্তুযা ছাহেব। আমরা ঢেমসা নামক এলাকায় এ অঞ্চলের একমাত্র আহলেহাদীছ মসজিদে যাত্রি যাপন করি। সকাল সকাল নাস্তা সারার পর আমরা মোর্তজা ছাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রাস্তার ধারে ছোট-বড় টিলা, সারিসারি গাছ সর্বোপরি চারিদিকে সবুজের অপূর্ব সমারোহ। কখনো রাস্তার ধার ঘেঁষে কাটা পাহাড়ের মেটে হলুদ গাত্রে অপলক দৃষ্টি, কখনো দু'পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলা শস্যখেতে হারিয়ে যাওয়া, কখনোবা দিকচক্রবালে ভেসে উঠা দূরের গাঢ় নীলবর্ণ সারি সারি পাহাড়ের সৌন্দর্যে রুদ্ধশ্বাস মুগ্ধতায় জমে যাওয়া– এ সবের মাঝেই সাড়ে নয়টার দিকে রামুর সাফারী পার্কে পৌঁছলাম। বিশাল এলাকা জুড়ে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য হিসাবে সরকারীভাবে গড়ে তোলা হয়েছে এই সাফারী পার্ক। প্রবেশ করে দেখা যাবে কৃত্রিম কিছু প্রাণী। ভেতরে রয়েছে বণ্য প্রাণীর জাদুঘর এবং সেখানে আছে বিভিন্ন প্রাণীর কঙ্কাল ও দেহাবশেষ। পার্কের মূল অংশে আছে খাঁচাবদ্ধ পাখি ও জীবজন্তু। আর গহীন অংশে আছে বাঘ, সিংহ, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি। সেখানে সবচেয়ে উপভোগ্য বিষয়টি ছিল পর্যবেক্ষণ চূঁড়ায় (watch tower) আরোহণ করা। আটতলা উচ্চতার এই টাওয়ারের চূঁড়া থেকে পার্কের প্রায় পুরো এলাকা দেখা যায়। অসাধারণ সে দৃশ্য! দেড় ঘণ্টা পর বেলা ১১-টায় সেখান থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

কক্সবাজারে সমুদ্র সৈকতে : পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত, যার মায়াবী আর্কষণে দেশ-বিদেশের বহু সৌন্দর্যপিয়াসী এখানে ছুটে আসে। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে পর্যটন এলাকায় যখন আমাদের গাড়ি পৌঁছল তখন বেলা সাড়ে ১২-টা। গাড়ি পার্কিং করতে না করতেই সবাই একযোগে নেমে পড়লাম। বহুল আকাংখিত সমুদ্র সৈকত এই আমার চোখের সামনেই! শিহরীত বিস্ময় নিয়ে সৈকতের দিকে পা বাড়ালাম। চক্ষু স্থির হয়ে গেল। মধ্যদুপুরের তীব্র রৌদ্রচ্ছটা দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় যেন মুক্তোর টুপি পরিয়ে দিয়েছে! অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যে চোখ ঝাঁ ঝাঁ করে উঠে। বিশাল বিশাল ঢেউয়ের গুরুগম্ভীর মেঘের মত আওয়াজ সমুদ্রের বিশালতার প্রতি নিমিষেই শ্রদ্ধার ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলে। কিঞ্চিৎ পা ডুবিয়ে হতবিহ্বল নেত্রে হারিয়ে গেলাম সাগরের বিশালতায়। ছোট-বড় অসংখ্য ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ছে অবিরাম, প্রতিনিয়ত জানান দিচ্ছে স্রষ্টার অস্তিত্বের সীমাহীন অনুকম্পা। যে স্রষ্টা এত বিশাল করে এই সমুদ্রকে সৃজন করেছে তিনি কত মহান! অন্তর জগৎ নিংড়ে শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতার বান ডাকল, মস্তক অবনত হল স্রষ্টার প্রতি। সৈকতে হাজার হাজার মানুষ। বালক-তরুণ-প্রৌঢ় সকলেই যেন বয়সের বাঁধ ছাপিয়ে সমুদ্রবক্ষে গা ভাসিয়েছে। কারো প্রতি কারো লক্ষ্য নেই। টানা প্রায় তিন ঘণ্টা সেখানে আমরা ঢেউয়ের সাথে দাপাদাপি করলাম, প্রথম সমুদ্রদর্শনের স্মৃতি চিরজাগরূক রাখতে। এক ফাঁকে সাথে নিয়ে যাওয়া ফুটবল নিয়ে খেলাধূলায় মত্ত হলাম, এঁকে দিলাম সৈকতের বালুকাবেলায় আমাদের স্মৃতির পদচিহ্ন। অতঃপর বিকাল ৪-টা নাগাদ কক্সবাজারে আমাদের ৩দিনের জন্য ভাড়া করা নতুন ডেরায় ফিরলাম। দুপুরের খাবার গ্রহণ করেই আবার বিকাল পাঁচটায় আমরা হিমছড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই।

হিমছড়ির পাহাড়ে : হিমছড়ি কক্সবাজার পর্যটন এলাকা থেকে ৮-১০ কিঃমিঃ দূরত্বে অবস্থিত। জনবসতিহীন শুনশান রাস্তার একদিকে গাছ-গাছালী ছাওয়া, লতা-গুল্ম ঢাকা, ছোট-মাঝারী-বড়, খাড়া-ঢালু হরেক কিসিমের পাহাড়, অন্যদিকে ২০০ মিটার দূরত্বে বিশাল সমুদ্র। রাস্তার ধারে কিছু কিছু পাহাড় এতটা খাড়া যে মনে হয় এই বুঝি ধ্বসে পড়ল। মনে পড়ে গেল, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণে ছলছাতুরী করায় আল্লাহ্ তাদের মাথার উপর তূর

পর্বত উঠিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তারা পর্বতপিষ্ট হয়ে মরার ভয়ে ঈমান এনেছিল। মাথার উপর পর্বত ঝুলন্ত থাকলে তখন অবস্থা কেমন হবে মানবমন কি তা কল্পনা করতে পারে, যতক্ষণ না এরূপ দৃশ্য দেখে? নিঃসন্দেহে তা কল্পনার ঊর্ধ্বে। সূর্য তখন প্রায় অস্তগামী, এমন সময় আমরা হিমছড়ি পর্যটন এলাকায় পৌঁছলাম। গাড়ী থেকে নেমে পাহাড়ে ওঠার জন্য দল বেঁধে ছুটলাম। সকল বাধা পেরিয়ে ভয়কে জয় করে দক্ষ পর্বতারোহীর মত সারিবদ্ধভাবে উঁচু উঁচু পাহাড়ের একটি চূড়ায় উঠে গেলাম। পর্বত চূড়ায় দাঁড়িয়ে আরো একবার বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম প্রকৃতি অপরূপ সৌন্দর্যে। সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার ছিল, সাগরের মাঝে যে বর্ণিল সূর্যাস্ত দেখার জন্য মানুষ সৈকতে অধির অপেক্ষায় থাকে, তা দর্শনের সৌভাগ্য হল আমাদের আরো অসাধারণ এক লোকেশন থেকে। সহস্র মুখের মুগ্ধ চাহনীর প্রতি বিদায়ী সম্ভাষণ জানিয়ে রক্তিম বেশে সাগরগর্ভে সূর্য যখন মুখ লুকাচ্ছে, প্রকৃতিতে তখন অবিরলধারায় চলছে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের আলোড়ন। ক্রমশঃ আঁধার ঘনিয়ে আসছিল, এই মুহূর্তে পাহাড় থেকে নামা ভয়ানক আনন্দের। অবশেষে পাহাড় থেকে নেমে সোয়া ছ'টার দিকে রওনা হলাম এবং কক্সবাজার এসে নির্ধারিত হোটেলে রাত্রিযাপন করলাম।

সেন্টমার্টিনে কিছুক্ষণ : ভোর ছ'টায় রওনা হয়ে বেলা পৌনে ন'টায় আমরা পৌঁছালাম টেকনাফের দমদমিয়ায়। এখান থেকেই লঞ্চ ছেড়ে যায়। কক্সবাজার থেকে টেকনাফের দূরত্ব ৮০ কি:মি: হলেও রাস্তা সরু ও আঁকাবাঁকা, যার কারণে সময় একটু বেশি লাগে। লঞ্চঘাট নাফ নদীতে। আর এই নদীকে কেন্দ্র করে এলাকার নাম হয়েছে টেকনাফ। বাংলাদেশ ও বার্মাকে বিভক্তকারী সীমানা রচনা করেছে এই নাফ নদী। 'কেয়ারী সিন্দাবাদ' নামের সুন্দর এই লঞ্চটি আমাদের নিয়ে যাত্রা শুরু করল ঠিক বেলা সাড়ে ন'টায়। নদীর বুক চিরে মৃদু-মন্দ গতিতে চলছে আমাদের লঞ্চ। বামে অনেক দূরে বার্মার উঁচু উঁচু পাহাড় আর ডানে বাংলাদেশের ছোট-বড় সবুজ পাহাড় ও বাড়ীঘর, পাহাড় কেটে নির্মিত সরু রাস্তাও দেখা যায়। লঞ্চ ছাড়ার সাথে সাথে একঝাঁক সমুদ্র খেচর এ্যালবেট্রস কোথা থেকে এল তা ঠিক অনুধাবন করতে পারিনি। দৃষ্টিনন্দন তার রং, আকৃতি আর অনুসরণের ভঙ্গি। কি নিখুঁত নিখিল অধিপতির সৃষ্টি! ঘণ্টাখানিক বা তারও বেশকিছু পর নদী শেষ হয়ে আসল। আমরা পৌঁছলাম সমুদ্রের সীমানায়। সেখানে জনশূন্য বালুকাময় শাহপরীর দ্বীপ সমুদ্রের বুকে লম্বা জিহ্বা টেনে বসে আছে। সমুদ্র ও নদীর মিলনস্থলে সে-ই আল্লাহর সৃষ্টির অসাধারণ এক নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হল, যা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন *(ফুরক্বান ৫৩, রহমান ১৯)*। দুই জলাধারের পানির মাঝে এক লম্বা সুস্পষ্ট ব্যবধানরেখা আমাদের দৃষ্টিতে পড়ল। বিস্ময়ে আরো একবার সুবহানাল্লাহ পড়লাম। কিছুক্ষণ পর দূর সমুদ্রে একটি অস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠল। লঞ্চ সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল রেখাটি। হ্যাঁ, অনুমান ঠিক, এটাই আমাদের স্বপ্নের সেন্টমার্টিন। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন মাত্র ৬ কি:মি: আয়তনবিশিষ্ট এই সেন্টমার্টিনে যখন পা রাখছি, তখন দিনমণি মধ্যগগনে বসে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছিল। তখন প্রায় বেলা ১২টা বেজে গেছে। চারিদিকে নীল সমুদ্রের মায়াবী আহ্বান। স্বচ্ছ ঢেউয়ের ভদ্র আস্ফালনে সমুদ্রতীর মুখর হয়ে উঠেছে। কালো কালো খরখরে ধারালো প্রবালে ঢাকা সৈকত। তা পেরিয়ে পানিতে নামাই বেশ কষ্টকর। প্রবালের গঠন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের দুটি মত আছে। কেউ বলেন, শামুক ও সামুদ্রিক কীট মরে এক সাথে জমাট বেঁধে এরূপ পাথরের সৃষ্টি হয়েছে, আর কেউ বলেন, শামুক ও সমুদ্রকীটের মল জমাট বেঁধে এগুলোর সৃষ্টি। যেভাবেই সৃষ্টি হোক না কেন, তা একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। পাথরের ন্যায় নিশ্চল অথচ তা বড় হয় ধীরে ধীরে। প্রবাল আর প্রবাল! একটু এগিয়ে দেখলাম জঙ্গি বিমান আকৃতির কিছু একটা বালির উপর পড়ে আছে। কাছে যেতেই বুঝতে পারলাম তা সামুদ্রিক কোন প্রাণী। তীর থেকে কিছুটা ভিতরে সারি সারি নারিকেল গাছ। বৃত্তাকার এই দ্বীপের সর্বত্রই এরূপ নারিকেল গাছের প্রাচুর্য দেখা যায়, যে কারণে এর আরেকটি নাম হয়েছে নারিকেল জিঞ্জিরা। আর এর ফাঁকে ফাঁকে দ্বীপবাসীরা পর্যটকদের জন্য কোথাও কোথাও বাঁশ ও খুঁটি দিয়ে তৈরী করেছে অস্থায়ী দোকান। বিস্মিত হলাম শুটকির দোকান দেখে। ৪-৫ ফুট লম্বা মাছ শুটকি করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এক স্থানে এসে বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়ালাম নারিকেল গাছের সদৃশ সুন্দরবনের সেই গোলপাতা গাছ দেখে। গোটা দ্বীপ জুড়েই বালুকাময় ভূমি। এর মাঝেই নারিকেল আর গোলপাতা গাছে ভরা সবুজের সমরোহ। ছবির চেয়েও যেন সুন্দর! এখান থেকে আরো দক্ষিণে জোয়ারের সময় সেন্টমার্টিন থেকে বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড ছেড়াদ্বীপ, যা দেশের সর্বশেষ স্থলভাগ। পর্যটকদের থাকার জন্য দ্বীপে বেশ কিছু রিসোর্ট ও কটেজ রয়েছে। পর্যটকদের আর্কষণের জন্য কটেজগুলো প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমতার মিশেলে সাজানো হয়েছে। গোটা দ্বীপে পাকা বাড়ী বলতে একটি মাত্র তিনতলা সরকারী ভবন আর হাতেগণা কয়েকটি ইটের ঘর রয়েছে। কটেজে পানি পান করতে গিয়ে শুনলাম এক আশ্চর্য কথা। ভূমি তথা বালুর ১৫ ফিটের মধ্য থেকে ওঠে মিঠা পানি, আর তার নিচ থেকে ওঠে লোনা পানি, কয়েক ফিট ব্যবধানে পানির এই তারতম্য! কতই না রহস্যময় আল্লাহ সৃষ্টি সুবহানাল্লাহ..!! আল্লাহ তাআলার এক অপূর্ব নিদর্শন এই সেন্টমার্টিন। এখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত আল্লাহভীরু। ছোট্ট সোনামণিরা কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে হেঁটে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় মহিলারা খুব পর্দানশীন। তাদেরকে বের হতে দেখা যায় না। স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জেনেছিলাম দ্বীপে একটা নির্দিষ্ট স্তর আছে যার উপর সাগর উত্তাল হলেও পানি ওঠেনা। এমনকি সিডর, নার্গিস, আইলাতেও পানি ওঠেনি। অথচ সমুদ্র থেকে এর উচ্চতা সামান্যই। সত্যিই আল্লাহ ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারেন যা বান্দা কল্পনাও করতে পারে না। মনে হল ধর্মপ্রাণ এই দ্বীপবাসীর উপর আল্লাহর অনেক রহমত আছে। বেলা তিনটাতেই আবার ফিরতি যাত্রা। সমুদ্রের দুলুনী আর নাফ নদীতে পড়ন্ত বিকেলের রূপোলী ম্লানিমা, আঁধার ঢাকা পাহাড়ী জঙ্গলের অদ্ভুত নৈঃশব্দ আর সিঁদুর রাঙা আবিরের রূপসুধা আকণ্ঠ অবগাহন করতে করতে টেকনাফ ফিরে এলাম। সেখান থেকে রাত্রি প্রায় ১০টার দিকে আবার কক্সবাজার ফিরলাম।

রাতের সমুদ্র : কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের প্রতিটি মুহূর্তই যেন মনোমুগ্ধকর। সকালে তার এক রূপ, দুপুরে এক রূপ, বিকালে এক রূপ আর রাতে আরেক রূপ। কোন রূপটা বেশী আকর্ষণীয়? এ নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। তবে অনেকের মতে, আসল সৌন্দয মূলতঃ রাতেই। তাই সেন্টমার্টিন থেকে ফিরে কয়েকজন বন্ধু মিলে রাত্রি ১১টার দিকে সৈকতের দিকে রওনা হলাম। সৈকত একেবারে জনশূন্য! চারিদিকে অমাবশ্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না, কেবলই ভয়ংকর হৃদয় কাঁপানো গর্জন। প্রচণ্ড বাতাস আর সাথে সাথে ঢেউয়ের উত্তাল নাচন। ভয়ানক গর্জন করে এসে তটে আছড়ে পড়ছে একেকটা ঢেউ। মাঝে মাঝে এত জোরে ঢেউ আসছিল যে মনে হয় সবাইকে টেনে নিয়ে যাবে। জোয়ারের সময় হওয়ায় সমুদ্র এত উত্তাল। তবে বড় ভাইয়েরা বললেন, চাঁদনী রাতেই আসল সৌন্দর্য টের পাওয়া যায়।

রাঙ্গামাটির পাহাড়ে : কক্সবাজারে পরদিন শেষ বেলা পর্যন্ত সৈকতেই কাটালাম। অতঃপর বিকাল পাঁচটার দিকে কক্সবাজারকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলাম সাতকানিয়ার উদ্দেশ্যে। রাতটুকু সেখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে রওনা হলাম রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে। রাঙ্গামাটি যেলায় প্রবেশের পর শুরু হল আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ। রাস্তায় চড়াই-উৎরাইয়ের কোন শেষ নেই। এখানে উঁচু তো ওখানে নিচু। একপাশে উঁচু পাহাড় তো অন্য পাশে হাজার মিটার গভীর খাঁদ। পাহাড়ের ঢাল কেটে নির্মিত রাস্তা। ভয়ংকর কিন্তু অতি চমৎকার সব পাহাড়ী বাঁক পেরিয়ে রাঙ্গামাটি পর্যটন কেন্দ্রে যখন পৌছলাম, তখন পৌনে ১০-টা বেজে গেছে। শহরে ঢুকতেই মনে হল পুরো শহরটাই পানি দ্বারা আবৃত। চারিদিকে কাপ্তাই হ্রদ ঘিরে আছে রাঙ্গামাটিকে। পর্যটন কেন্দ্র দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম সবাই। প্রবেশ করেই দেখলাম সেই বিখ্যাত ঝুলন্ত ব্রীজ। দু'টি উঁচু থামের সাথে সংযুক্ত অনেকগুলো লম্বা তারের সাথে ব্রীজটি ঝুলন্ত রয়েছে বলে একে ঝুলন্ত ব্রীজ বলা হয়। খুব মনোরম লোকেশনে ব্রীজটির অবস্থান। এখানে যে দিকেই তাকাই চোখ জুড়িয়ে যায়। ব্রীজ পার হলেই বড় বড় টিলা যেগুলো কিছু কিছু ব্যক্তি মালিকানাধীন। সেখানে চাকমারা কোন রকম মাথা গোঁজার ঠাই করে নিয়েছে। সেখানে মূলত পাহাড়ী চাকমা উপজাতি ও বাঙ্গালীদের বসবাস। তারা শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত মনে হল তাদের। তাদের শিক্ষাগার বলতে পুরাতন দোতলা ভবনে একটিমাত্র বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজয় চাকমার মাথে আলাপ করে জানতে পারলাম, এখন এই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে এবং ভাল ফলাফলও করছে। তবে শিক্ষকদের বেতন একেবারে নগণ্য। স্থানীয়ভাবে চাঁদা উঠিয়ে শিক্ষকদের বেতনভাতা প্রদান করা হয়, শিক্ষার্থী সংখ্যা মোটামুটি ভাল। কম বেশী প্রকৃতির সাথে লড়াই করেই তারা এখানে জীবনযাপন করছে। পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে এ স্থান গড়ে না উঠলে হয়ত তাদের জীবনযাত্রার মান আরো নিম্ন হত। একটি টিলার উপরে তাদের উপাসনালয় 'ধর্মঙ্কুর বিহার' দেখলাম। আশেপাশের টিলাগুলো খাড়া ঢাল বিশিষ্ট। সেখানে উঠতে আমাদের বেগ পেতে হচ্ছিল। অথচ স্থানীয়রা অনায়াসে তরতর করে উঠানামা করেছে। অসংখ্য পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে নীল সৌন্দর্যের আরেক লীলাভূমি এই কাপ্তাই হ্রদ। সুগভীর এই হ্রদের আয়তন ১৬৫ বর্গ কিঃমিঃ। হ্রদের পানিতে গোসল করতে নামলাম, তবে পরিবেশ শুনশান হওয়ার কারণে ভয় ভয় করছিল। বোটযোগে হ্রদ দিয়ে অনেকটা ভেতরে গেলে দেখা যেত শুভলং ও অন্যান্য ঝর্ণা। কিন্তু সময়ের অভাবে আমরা সেখানে যেতে পারিনি। অতঃপর দুপুরের খাওয়া সারলাম বিকাল পৌনে চারটার দিকে। তারপর আমরা রওনা হলাম আপন ঠিকানা রাজশাহীর উদ্দেশ্যে।

বাড়ী ফেরা : বহু পথ ভ্রমণ করে অনেক সুখস্মৃতি, অনেক অভিজ্ঞতার ডালি নিয়ে অবশেষে ১০ই ফেব্রুয়ারী দুপুরে মারকায প্রাঙ্গণে এসে পৌছলাম। আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক দশ মিনিট পরই মসজিদের মাইক থেকে মুয়াযিযনের সুললিত কণ্ঠে ধ্বনিত হল যোহরের আযান। বাকী জীবন প্রথম সমুদ্র দর্শনের এই স্মৃতি আমাদের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যাবে অনুক্ষণ–এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায়।

- ***লেখক:*** *আলিম ২য় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী।*

পাহাড়ের নেশায় আত্মভোলা একদিন

-আব্দুর রাকীব

প্রতিবছরের মত এবারও আয়োজন করা হল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যুবসংঘে'র উদ্যোগে শিক্ষাসফর। সফরের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল শেরপুরের মধুটিলা ইকোপার্ক এবং গজনী অবকাশ কেন্দ্র। প্রায় ৬০ সদস্যের সফরসঙ্গী নিয়ে বরাবরের মত আমরা **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল- মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' থেকে যাত্রা শুরু করি। যাত্রার পূর্বমুহূর্তে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড.মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সফরকারীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা মূলক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের শিক্ষাসফরের উদ্দেশ্য যেন হয় আদর্শ মানুষ হওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ। তোমরা সর্বাবস্থায় সত্য-ন্যায়ের আদর্শের উপর অবিচল থাকবে, আর বাতিলের বিরুদ্ধে থাকবে আপোষহীন।' গাড়ী ছাড়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে থেকে বিদায় জানান। আমাদের সফরসঙ্গী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, দফতর সম্পাদক আব্দুর রাকীব ও সাবেক অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় যুবসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সাধারণ ছাত্রবৃন্দ। বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মুকাররম বিন মুহসিনের দো'আ পাঠের মাধ্যমে রাত্রি ১১-টা ৩০ মিনিটে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। ভোর ৫টা নাগাদ আমরা শেরপুর পৌছে যাই এবং একটি মসজিদে ফজরে ছালাত আদায়ের জন্য যাত্রাবিরতি করি। আবার যাত্রা শুরু হয় শেরপুর শহর থেকে ১০/১৫ কিঃ মিঃ উত্তরে সরকারী ইকোপার্ক মধুটিলার উদ্দেশ্যে। সকাল সাড়ে ৬-টার দিকে আমরা মধুটিলা পৌছাই। সেখানে সকালের নাস্তা সেরে ইকোপার্ক পরিভ্রমণের জন্য আমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ি। প্রথমেই উঠলাম পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে। যেখান থেকে অত্র অঞ্চলের গারো পাহাড়গুলো প্রায় পুরোটাই সহজেই নজরে পড়ছে। উঁচু উঁচু টিলা আর গাছপালা ছেয়ে আছে সমস্ত জায়গা জুড়ে। সকালের হালকা কুয়াশায় আর মিষ্টিরোদে হেসে ওঠা বাহারী গাছপালা পরিবেষ্টিত গারো পাহাড়ের সারি তার ঝলমলে শোভায় আমাদের মোহিত করে ফেলল। রঙিন স্বপ্নীল এই দৃশ্যপট এক অদৃশ্য মায়াবী হাতছানিতে পাহাড়কে আপন করে নেওয়ার প্রবল আমন্ত্রণ জানালো আমাদের। টাওয়ার থেকে নেমে সেই আমন্ত্রণে সাড়া দেয়ার জন্যই যেন আমরা বিপদ-আপদের আশংকা সব ভুলে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে বন্ধুর পথ অতিক্রম করে দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী খাঁজে নেমে এলাম। তারপর আবার একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এলাম, ঝোঁপঝাড়ে ছাওয়া গুহাকৃতি এক সরু টানেল পেরিয়ে। অসাধারণ সে অনুভূতি। সেখান থেকে সারি সারি পাহাড়ের রাজ্যে ঢুকে পড়লাম। খাড়া, পিচ্ছিল পথ বেয়ে আবার নীচে নামলাম। আবার অন্য পাহাড়ে উঠলাম। এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যাওয়ার জন্য পার্ক কর্তৃপক্ষ ইটে বিছানো পথ তৈরী করে রেখেছে। কিন্তু সেসব পথ ছেড়ে আমরা বেছে বেছে বন্ধুর পথগুলো ধরে পাহাড়ী পথে ঘোরার সাধ উপভোগ করছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তবুও যেন সাধ মেটে না। আশপাশের প্রায় সকল উঁচু পাহাড় পরিভ্রমণ শেষে এক পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত সরকারী রেস্ট হাউজের সামনে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। অতঃপর ফিরতি পথে মিনি চিড়িয়াখানা,

পাহাড়ের মাঝে কৃত্রিম লেক ইত্যাদি দেখলাম। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা সেখানে বেড়ানোর পর আমরা গজনী অবকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। প্রায় ১৫/২০ কিঃ মিঃ দূরত্বের এ পর্যটনস্পটে পৌঁছতে আমাদের বেলা সাড়ে ১১-টা বেজে গেল। সেখানে আবার প্রায় একই ধরনের প্রাকৃতিক দৃশ্য। চারিদিকে যতদূর দেখা যায় শুদ্ধ সবুজ গারো পাহাড়ের অপরূপ মেলা। একটু আগের সেই পাহাড়ী পথে ঘোরার নেশা আবার আমাদের পেয়ে বসল। ঠিক পূর্বের মতই দলে দলে ভাগ হয়ে গেলাম। পরিকল্পনা করলাম পশ্চিম প্রান্তের উঁচু পাহাড় দিয়ে শুরু করে উত্তর প্রান্ত হয়ে গোটা এলাকা ঘুরে আবার পূর্ব প্রান্ত ফিরে আসব। শুরু করলাম মিনি ট্রেকিং। লোকালয় থেকে দূরে গিয়ে আমরা ক'জন হারিয়ে গেলাম বুনো সৌন্দর্যের রাজ্যে। এক টিলা থেকে আরেক টিলা, একচূড়া থেকে আরেক চূড়া দিশাহীনভাবে। দেখা পেলাম একটি ছোট্ট কিন্তু মনোহারী ঝর্ণার। সেখানে হাত-পা ভিজিয়ে অনেক্ষণ কাটালাম। আবার এগিয়ে চলা। পথ হারিয়ে ফেলব না তো! নির্জন এলাকায় সুযোগ পেয়ে কেউ কিছু হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে না তো! দু'একবার মাথায় এসব দুশ্চিন্তা ঢুকলেও তা ঝেটিয়ে বের করে দিলাম। একবার এক গারো কিশোরের দেখা পেলাম, কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তেমন সাড়া পেলাম না। ওদেরকে মনে হল কিছুটি রুক্ষ আচরণের। নিজেদের পরিচয়ে তারা গারো না বলে খৃষ্টান বা বাংলাদেশী বলতেই তারা বেশী উৎসাহী। বিষয়টি একটু ভিন্ন রকম ঠেকল। পাহাড়ে খাওয়ার পানির খুব সমস্যা। গভীরভাবে খনন করা একটি কুপ থেকে এক গারো ব্যক্তির সহযোগিতায় পানি তুলে আমরা তৃষ্ণা মেটালাম। কয়েকটি টিলার মাথায় গারোদের বাড়ি-ঘর দেখে উপরে উঠলাম। অধিকাংশ বাড়িতেই কেউ নেই। কাজে গেছে হয়ত কোথাও। ভর দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ভারতীয় বর্ডারের কাছাকাছি পৌঁছলাম। বর্ডারের পরই ভারতের মেঘালয় রাজ্য। সেখানে দেখা যায় আরো উঁচু উঁচু পাহাড়। আর না এগিয়ে আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। এ পাহাড়, সে পাহাড় ঘুরতে ঘুরতে পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের কাছে এসে পৌঁছলাম। অতঃপর মসজিদে ছালাত আদায় করে আমাদের রান্নাস্থলে পৌঁছে দুপুরের খাবার সেরে নিলাম। অবকাশ কেন্দ্রের মুখেই রয়েছে বেশ বড় একটি লেক। সেখানে আমরা অনেকেই গোসল করলাম এবং প্যাডেল নৌকায় ঘুরে বেড়ালাম। বিকেল ৪-টার দিকে আমরা সেখান থেকে টাঙ্গাইলের মধুপুর ভাওয়ালের গড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। কিন্তু পৌঁছার পূর্বেই সন্ধ্যা নেমে আসায় সেখানে আর যাওয়া সম্ভব হল না। তাই রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে আধো আলো আধো অন্ধকারের মাঝে আনারস গাছ থেকে দুধের সাধ ঘোলে মিটানোর চেষ্টা করলাম। এতে ভাওয়ালের গড় দেখার আফসোস কিছুটা হলেও কমল। এরপর রাজশাহী অভিমুখে আমাদের ফিরতি যাত্রা শুরু হল। সফরে অংশ গ্রহণকারী সকলের মাঝে বিতরণ করা হল রাবি যুবসংঘের নামাঙ্কিত প্যাড, কলম এবং রাবি যুবসংঘ স্মরণিকা ২০১০। এছাড়াও নতুনদের জন্য ক্যালেন্ডার, 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকা হাদিয়া দেয়া হল। সকলের ভ্রমণক্লান্তির কারণে কুইজ প্রতিযোগিতা আর হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি এই শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং এর মাধ্যমে কর্মীদের পারস্পরিক বন্ধনের দৃঢ়তা ও সাংগঠনিক কাজে স্বতঃস্ফূর্ততা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অবশেষে রাত ১২টার দিকে আমরা রাজশাহী পৌঁছে গেলাম নিরাপদে, *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।*

- ***লেখক:*** *কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।*

আলোকপাত

???? *আমি দাওয়াতী কাজে অনেক দিন ধরেই সম্পৃক্ত ছিলাম। বিভিন্ন মসজিদে ও ইসলামী সমাবেশে বক্তব্য দেওয়া, সাংগঠনিক প্রোগ্রাম পরিচালনা ইত্যাদি কাজে যথেষ্ট সময় দিয়েছি। এর মাধ্যমে আমি নিজের আত্মিক দিক ক্রমান্বয়ে উন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। বেশ কয়েকটি বছর এ লক্ষ্যে ব্যাপক পরিশ্রম করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে যে, আমি মানুষকে দাওয়াতদানের উপযুক্ত নই। কেননা আমি মানুষকে যা বলি, তার অনেক কিছুই নিজে পালন করতে পারি না। তাই আমি দাঈ হিসাবে মানুষের সামনে আর না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেবল ইসলামের খেদমতে সামান্য একজন কর্মী হয়ে থাকতে চাই। আমি আমাকে আর প্রতারিত করতে চাই না, অন্যদের সামনে আর মুনাফিক হতে রাযী নই। এখনই কি সঠিক সময় নয়, আল্লাহর কাছে লজ্জিত হওয়ার? তিনি বলছেন, হে ঈমানদারগণ! কেন তোমরা তা বল যা তোমরা নিজেরা কর না (ছফ ২-৩)। এখনই কি সময় নয় জীবনের শেষ দিনগুলোকে সঠিক রাস্তায় ফিরিয়ে আনার এবং অতীতে যা কিছু উপেক্ষা করেছি তার দিকে মনোযোগী হওয়ার? আল্লাহর কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি আমার অতীত পাপের ক্ষমার জন্য এবং আগামী দিনে তাঁর সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই সৎআমল সম্পাদনের তাওফীক দানের জন্য।*

-হাসান ফেরদাউস,
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

প্রিয় ভাই! মূলতঃ আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান আত্মার জন্য একটি উত্তম প্রশিক্ষণ। আপনি যদি নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চান, তবে অন্যকে সৎপথের দিকে আহবানের পথ থেকে সরে আসা আদৌ উচিৎ হবে না। কেননা আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য যা কিছু প্রয়োজন, দাওয়াত প্রদানের জন্যও ঠিক ঠিক তা-ই প্রয়োজন। কেননা যখন আপনি পরিশুদ্ধি অর্জন ও সত্যের পথ দেখানোর জন্য মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন, তখন আপনি আপনার অজান্তে নিজেকেও অনুরূপ পরিশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন। মানুষকে আল্লাহর দিকে তথা ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে গেলে নিজেকেও কি আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়া, তাঁর কাছে দো'আ করা বা তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হয় না? যেমন পবিত্র কুরআনে সূরা আ'রাফের ৮৯নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শু'আইব (রাঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দিন এবং আপনিই তো সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী।' দাওয়াত দিতে গেলে নিজের নৈতিক মূল্যোবোধের উপর সুদৃঢ় থাকার প্রতিজ্ঞা কি নিতে হয় না? যেমন আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং তুমি উহার দিকে (সকলকে) আহ্বান কর এবং তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে তার উপর সুদৃঢ় থাক। আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না (*শূরা ১৫*)।' এ কাজে কি পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ, ছাড় প্রদান, আশা-প্রত্যাশা রাখার মত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হয় না? যেমন রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমরা (মানুষের কাজকে) সহজ করে দাও, কঠিন করো না; তাদেরকে সুসংবাদ দাও, বিমুখ করে দিও না (*মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭২২*)। এ কাজে কি একনিষ্ঠতা, একাগ্রতার প্রয়োজন হয় না? যেমন নূহ (আঃ)-এর বক্তব্য পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি (সত্যের পথে) ডেকেছি (*নূহ ৫*)।' মানুষের সাথে কি সত্য প্রকাশের জন্য হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে বক্তব্য-বিতর্ক করতে হয় না? যেমন আল্লাহ বলেন, 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং যুক্তিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায় (*নাহল ১২৫*)। এভাবে দেখা যাচ্ছে মানুষকে দাওয়াত প্রদানের সকল স্তরে প্রকারান্তরে আপনি নিজেকেও প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন। তাই হতাশ হবেন না। আপনার নৈতিক দুর্বলতা কাটানোর সবচেয়ে বড় মাধ্যম মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান জানানো। এ পথে প্রতিটি পদক্ষেপই আপনাকে দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখবে। পাপের কারণে যদি দাওয়াত প্রদান থেকে পিছিয়ে আসেন তবে তাতে আপনার দ্বীনের পথ থেকে পিছলে যাওয়ারই ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। তাই শয়তানের প্ররোচনায় কোন পাপ করে ফেললে দ্রুত তওবা করুন এবং নিজেকে ও অন্যদেরকে সে পাপের কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার খুলুছিয়াতের বিনিময়ে আপনাকে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করবেন।

অন্যদিকে দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে আপনার পাপও দূরীভূত হতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'নিঃসন্দেহে সৎ কার্যাবলী মুছে ফেলে মন্দ কাজসমূহকে (*হূদ ১১৪*)।' রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর। আর কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে সাথে সাথেই কোন পূণ্যের কাজ কর, যা তাকে মিটিয়ে দেবে। আর উত্তম চরিত্র ও ব্যবহার নিয়ে মানুষের সাথে মেলামেশা কর (*আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩, সনদ হাসান*)।

সুতরাং আপনাকে বলব, মানুষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে পথভোলা মানুষকে সত্যের দিকে দাওয়াত প্রদানে আমরা কোনরূপ অবহেলা করতে পারি না। কারণ এটা প্রত্যেক মুসলমানের উপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত দায়িত্ব (*আলে ইমরান ১১০*)। ইনশাআল্লাহ এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই আপনি নিজেকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন এবং আল্লাহর প্রিয়তম বান্দাদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।

???? *বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পর্কে জানার সবচেয়ে উপযোগী গ্রন্থ কোনটি?*

\- মাশরুর আহসান
দারুস সালাম আলিয়া মাদরাসা, রাজশাহী

কোন বিষয়ে উপযোগী গ্রন্থ কোনটি তা নির্ভর করে স্থানভেদে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্যের উপর। তবে সাধারণভাবে আক্বীদা সম্পর্কিত উপকারী গ্রন্থ সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই নাম আসে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রচিত 'আল-আক্বীদা আল-ওয়াসেত্বিয়া' (ব্যাখ্যাসহ), ইমাম তাহাবীর 'শারহুল আক্বীদা আত ত্বহাবিয়াহ', মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের 'কিতাবুত তাওহীদ (ফাতহুল মাজীদ-ব্যাখ্যাসহ)', 'কাশফুশ শুবহাত', 'ছালাছাতু উছূল' এবং ইবনে খুযাইমার 'কিতাবুত তাওহীদ' প্রভৃতি। এগুলো মৌলিক কিতাবের কোন কোনটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে। বাংলাভাষীদের জন্য ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের 'আক্বীদা ইসলামিয়াহ' নামক সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি পবিত্র কুরআনই সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে জানার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। পবিত্র কুরআনকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে (*ইসরা ৯*)।

Contents

জীবনের বাঁকে বাঁকে

শেকড়ের টানে, স্মৃতির নায়ে

-ফারহান দাউদ, চট্টগ্রাম

গ্রামের বাড়িতে গেলাম। ২ বছর পর। পেট্রোল পোড়া গন্ধের বাসে চড়ে, সিটের মাঝে 'দ' হয়ে বসে, অনেকদিন পর। যাওয়া হত না, দাদা অসুস্থ, দাদীও। যেতে হল বাবাকে নিয়ে। এক পূর্বপুরুষকে নিয়ে আরেক পুরুষের সাক্ষাতে। গৌরিপুর বাসস্ট্যান্ডটা বদলে গেছে। জনাকীর্ণ বাজার ছেড়ে বেশ দূরে সরে গেছে। রাস্তা দিয়ে আসার পথে গন্ধ পেলাম। গ্রামের গন্ধ, মাটির সোঁদা গন্ধ। বাজারের দিকে বাড়িঘর উঠে গেছে। আছে কিছু পাকা বাড়ি, পয়সাওয়ালা লোকজনের কাজ। একটা ৩ তলা হোটেলও দেখলাম, কোন এক কোটিপতি দারোগার মহল, বাবা জানালেন। তাও গন্ধটা যায়নি, মাটির গন্ধ, শেকড়ের। বাজারের দিন, শনিবার, সকালে তেমন কেউ নেই। দুই জায়গায় হাঁক দিয়ে বাবাকে ডাকল, রিকশা থেকে বাবা ইশারায় দেখিয়ে জোর গলায় বললেন, 'ভাইস্তা তোমাগো..' হাত নাড়ল না চেনা চাচারা। সালাম দেয়ার সময় হল না, চলন্ত রিকশায় ছুটন্ত আমরা।

ব্রীজটা পার হতেই খেপা গরু একটা রাস্তার মাঝখান দিয়ে তেড়ে এসে শিং নেড়ে গেল। রিকশাওয়ালা গরুর মালিককে কি একটা বলতেই মালিক দ্বিগুণ তেজে তেড়ে এলো। বাবা হাসে– 'আবেদ আলী, কাঠগোঁয়ার, এক স্কুলে পড়ত, রোজ ২-৪ টা মারামারি করতই, গরু আর মালিক একরকমই।' আমিও হাসি, গরু দেখে অথবা মাটির গন্ধে, খোলা হাওয়ায়। রাস্তাটা হাসপাতালের পরেও পাকা হয়েছে অনেকদূর। বাড়িতেও বিদ্যুৎ গেছে, দেখলাম। রিকশা থেকে নেমে আইল ধরে হাঁটি, বাবা হাত তুলে দেখায়, ঐ ক্ষেতটা আমার, আর এই ডানদিকেরটা। বাকিগুলি? ভাগ হয়ে গেছে। ভাল লাগে না। ভাগ কেন হবে? হবেই, সম্পর্ক ভাগ হয়, মানুষ হয়, আর জমি! বাড়িতে ঢোকার আগে পাশের বাড়ির দুই চাচাকে সালাম করতে হয়। 'ভাইসাব, ছেড়া কত বড় হইসে, ঐদিন দেখসি আবুডা!' 'ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ দিসে এইবার'–বাবার জবাবে বিস্ময় আরেকটু বাড়ে, নাগালের বাইরেই চলে গেল কিনা, ভাবে হয়ত।

বাড়িতে ঢুকি। শুনশান বাড়ি। অনেক ছোট লাগে আগের চেয়ে। এসব কারণে মোড়লবাড়ির সীমানা ছোট হয়ে এসেছে, ভাগ, বিক্রি, বিবাদ, দখল। আমিও হয়ে গেছি অনেকটা বড়, হাঁটিহাঁটি পা পা কালের বিশাল উঠানটা খুব ছোট লাগে, চেপে আসে। দাদীর জ্বর, চলাফেরা কম, দাদা শয্যায়, চিনতে পারেন অবশ্য। লোকজন নেই, বুড়োবুড়ি, শুনশান। চারপাশের গাছপালা কমে এসেছে, বাঁশঝাড় খালি প্রায়, চুরি হয় অনেক। পাশের বাড়ির লোকজন জানাল, জলপাই গাছটা বিক্রি হয়ে গেছে, শেকড় ডালপাতা সহ। লিচু গাছটা আছে এখনো। জলপাই পাড়ার বাঁশের কোঠারিটার কোন সন্ধান পাই না, গাছের সাথে কি সবই নিয়ে গেছে মিনিমাগনায়? যে কোদালটা ছোটবেলায় কাঁধে নিয়ে ঘুরতাম, সেটা কোথায়? ইজিচেয়ারটা কে নিলো? উঠানের বেলিফুলের গাছটা শুকনো, মরা। পানি পায় না কতদিন কে জানে? ফুল ধওে না অনেকদিনই। মৃত আর অর্ধমৃত গাছের ছায়া নিয়ে ছেলেবেলার বিশাল উঠানে দাঁড়িয়ে থাকি, মোড়লবাড়ির একমাত্র উত্তরাধিকারী, অধোমুখে। নিস্তব্ধতায়। পাখিগুলো কোথায়? মরা গাছেও তো ২-৪ টা পাতা আছে, ২-১টা কাক এলেও তো পারে। বেড়ার রান্নাঘরটায় উঁকি দিই, ছোট্ট রাজন একদিন তার উলের টুপিটা এখানকার একটা চুলাতেই বিসর্জন দিয়েছিল। লাকড়ির চুলায় অল অল তুষ দিয়ে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে চোখ লাল করে ফেলতো যে শিশু, সে কি এখনো বসে আছে চুলাটার পাশে, লাল সোয়েটার গায়ে? শূন্য চুলা ধাক্কা দেয় চোখে, শুধু পাশে বসা বিড়ালটার থাবা চাটা দেখে মনে পড়ে এমনি কোন সকালে ছুঁড়ে দেয়া মাছের কাঁটা খেয়ে অলস হাই তোলা বিড়ালগুলোর কথা। আচ্ছা, বাবার না একটা পোষা কুকুর ছিল! বাবা এলেই দাওয়ায় শুয়ে থাকত? গেল কই সেটা? জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে যাই। সবকিছুর মতই নিশ্চয়ই চলে গেছে, কি হবে আর টেনে? উঠানে ফিরে আসি। মরা গাছ, আর একটা চুলা। ঘুম থেকে উঠেই দাদীর পাশে বসে যেতাম চুলার আগুন নিতে। নেভানো চুলা, জ্বলে না মনে হয় আর। পুকুর পাড়ে দাঁড়াই, পানি কম, শীতকাল। পাড়ের কাঁঠালগাছটাও মরা মরা, কাঁঠাল কি হয়? পাশে দাঁড়ানো বাবা জানালো– হয়তো হয়, নেবার আগেই কেউ নিয়ে যায়। অনেক গাছ ছিল পুকুরপাড়ে, নেই একটাও, দেখার লোক নেই। পুকুরপাড়ের সামনে খড়ের গাদাটা কই? জমিই করানো হয় না, খড় আসবে কোত্থেকে? পাশের জমিটা চলে গেছে, তার পাশেরটা, তার পাশেরটাও, বিক্রি-বাট্টা, ভাগ। যা আছে, তাও তো খালি। শুনে বাবার উত্তর– 'বর্গা দেয়া যায় মরা গাছগুলো সাফ করে, কিন্তু আসা তো হয় না।'

সীমানায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকি, দূরে, কু-ঝিক-ঝিক রেলের ধোঁয়ার দিকে, লাল সোয়েটারের পরিপাটি চুলের ছোট্ট ছেলেটা ছোট্ট হাত-পা নিয়ে যেভাবে তাকাতো, ধানকাটা মাঠের দিগন্তে। রান্নাঘরের পিঠার ধোঁয়া নাকে আসে, পায়েসের গন্ধ, টিউবওয়েল চাপার শব্দ, কাঠ চেড়ার আওয়াজ, গরুর ডাক, উঠানে ছড়িয়ে পড়া মুরগির বাচ্চাগুলোর চিঁ চিঁ, ফুফুদের হাসাহাসি, ৩-৪টা অলস বিড়াল, আর সবার মাঝে ঘুরে বেড়ানো লাল সোয়েটারের ছোট্ট ছেলে।

বাবার ডাকে চটকা ভাঙে, লাল সোয়েটার না, জিন্স আর জাম্পারের শহুরে আমার। দিগন্তের ধানক্ষেত থেকে আবারো নিঝুম বাড়ির দিকে চোখ ফেরাই। সীমানা তো অনেক ছোট হয়ে গেছে। আর জমিগুলি না বেচলেও তো চলে। বাবার আশাবাদী কণ্ঠ– 'তুই না চাইলে বেচব কেন? ধর গাছপালা খানিকটা সাফ করে, আর বর্গা দিয়ে....'

বাবা সোৎসাহে বলে চলেন, আমি আনমনে মাথা নাড়ি, না বেচলেও চলে। একদিন তো ফিরতেই হবে উত্তরাধিকার চাইতে, একা, পূর্বপুরুষের পাশে, সাড়ে তিন হাতের ভাগ নিতে, আজ বা কাল, অথবা কয়েকদিন পর। না বেচলেও চলে...।

ওরা পাকিস্তানী

- রেহনুমা বিনতে আনীস
ক্যালগেরী, আলবার্টা, কানাডা

২০০৮ সালের নভেম্বরে আমরা যখন ক্যালগেরী এসে পৌঁছলাম, তখন শীত শুরু হয়ে গেছে। স্থানীয় লোকজনের মতে, সেবারের শীত ছিল গত দশ বারো বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ। বাংলাদেশের ভয়াবহ গরম থেকে সবেমাত্র এসে হঠাৎ মাইনাস ৪০ ডিগ্রীতে। তখনো আমরা কোন পরিস্থিতিতে কি করতে হয় খুব একটা বুঝে উঠতে পারিনি। একদিন মেয়েকে স্কুল থেকে আনার জন্য ছেলেকে স্ট্রলারে নিয়ে বেরিয়েছি। তাপমাত্রা মাইনাস ৩০/৩৫ হবে। কিন্তু মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল বরফের স্তূপ। তখন মাত্র এক পশলা তুষার পড়েছে। সাধারণত তুষার পড়া বন্ধ হলে রাস্তাঘাট পরিস্কার করা শুরু হয়। কিন্তু দেখলাম হাঁটু পর্যন্ত বরফ, অথচ তখনো সরানোর কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বহু কষ্টে বরফের স্তূপ ঠেলে ঠেলে স্ট্রলার নিয়ে পাড়ার ভেতর দিয়ে রাস্তার কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছলাম। কিন্তু রাস্তা থেকে তিনচার হাত দূরে স্ট্রলার যে আটকে গেল, সামনেও নিতে পারি না, পেছনেও আসে না। নির্জন রাস্তা, বরফের মৌসুমে লোকজন দেখাই যায় না, মেয়ের স্কুলের ছুটির সময় হয়ে এলো প্রায়, ছেলেকে কোলে নিয়ে এতদূর যেতে পারব না, কিন্তু ছেলে এই বরফের মধ্যে হাঁটতে গেলে ডুবে যাবে। ভীষণ বিপদে পড়ে গেলাম। ব্যতিব্যস্ত হওয়াতে খেয়ালই করিনি, কখন এক ক্যানাডিয়ান লোক রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে বিরাট পা ফেলে বরফের দেয়াল পেরিয়ে আমাদের কাছে চলে এসেছে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাওয়ার চেষ্টা করছ?' বললাম, 'রাস্তার ওপারের স্কুলে'। সে বাচ্চাসহ স্ট্রলার খেলনার মত তুলে নিয়ে রাস্তার ওপারে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি বললে আমি তোমাদের স্কুলের সামনে নামিয়ে দিতে পারি।' এদের সাহায্য করার স্বভাব এত বেশী যে, ওর অফারে মোটেই আশ্চর্য হলাম না। তবুও ধন্যবাদ দিয়ে তাকে যেতে দিলাম।

লোকটা চলে যেতেই দেখলাম রাস্তার অন্যপারেও একই সমস্যা। স্ট্রলার সামনেও যায় না, পেছনেও যায় না! কি করব ভাবছি। এমন সময় দেখি, একজন লোক মুখেচোখে মাফলার বেঁধে দৌড়াতে দৌড়াতে কাছে এলেন। আমাদের দেশে হলে ভয় পেতাম। কিন্তু এখানে তাপমাত্রা মাইনাস ১৫ থেকে নীচে চলে গেলে এটা না করে উপায় নেই, মুখের মাংসপেশী জমে যেতে পারে। লোকটা বলল, 'তুমি মনে হয় নতুন এসেছ, নইলে এমন আবহাওয়ায় কেউ স্ট্রলার নিয়ে বের হয়? তুমি কিছুতেই এই তুষারের ভেতর স্ট্রলার ঠেলতে পারবে না। যাচ্ছ কোথায় তুমি এই ঠাণ্ডার ভেতর এত ছোট বাচ্চা নিয়ে? বাচ্চা বাসায় রেখে এলে না কেন?' এতগুলো প্রশ্নের জবাব দেয়ার মত অবস্থা তখন আমার নেই । বললাম, 'মেয়েকে আনতে স্কুলে যাচ্ছি। বাসায় কেউ নেই, যার কাছে বাচ্চা রেখে আসতে পারি'। লোকটা বলল, 'আমিও স্কুলে যাচ্ছি আমার ছেলেমেয়েদের আনতে। এক কাজ কর। তোমার ছেলেকে আমি কোলে নিয়ে নিচ্ছি। তুমি খালি স্ট্রলার ঠেলে নিয়ে আস। তাহলে তোমার আর কষ্ট হবে না।

অনেক রাতে যেমন লোকজনের কথা বলার মুড থাকেনা, অনেক ঠাণ্ডায়ও ঐরকম হয়। উনি আমার ছেলেকে ওনার জ্যাকেটের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন, উষ্ণতার স্পর্শে যেন সে একটু প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। আমি খালি স্ট্রলার ঠেলে নিয়ে চললাম। স্কুলে গিয়ে দেখি ওনার মেয়ে যয়নব আমার মেয়ের এক ক্লাস জুনিয়র আর ছেলে তার এক ক্লাস নীচে। ফেরার পথে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাসা কোথায়?' আমি ঠিকানা বললে উনি বললেন, 'আমরাও তো ঐ পাড়ায় থাকি! চল, একসাথে যাওয়া যাক।' আমার ছেলেকে এতদূর কোলে নিয়ে উনি একটু কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। তাই এবার ওকে স্ট্রলারে বসিয়ে উনি গলা থেকে মাফলার খুলে স্ট্রলারের সামনে বেঁধে নিলেন। তারপর উনি সামনে থেকে টেনে নিয়ে চললেন আর আমি পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে চললাম। দেখলাম ওনাদের বাসা আমাদের পাড়ার পেছন দিকটায়। বাসার কাছাকাছি গিয়ে উনি ওনার স্ত্রীকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্ত্রীর পোশাক দেখে এতক্ষণে বুঝলাম ওরা পাকিস্তানী। শীতকালে কেউ দরজা বেশীক্ষণ খুলে রাখতে চায় না, ঘর ঠাণ্ডা হয়ে যায় বলে। কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই ওনার স্ত্রী বললেন, আমি চাইলে রাদিয়াকে ওনার বাচ্চাদের সাথে স্কুলে পাঠাতে পারি অথবা রিহামকে ওদের বাসায় রেখে রাদিয়াকে আনতে যেতে পারি। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বাসায় চলে গেলাম। আমরা যারা একাত্তরের অব্যবহিত আগে বা পরে হয়েছি, পাকিস্তানীদের প্রতি বিদ্বেষ তাদের মন-মগজ-মজ্জায় মিশে আছে। ৫২'র ভাষা আন্দোলনের সময় আমার দাদার ছোটভাই, আমার প্রিয় ছোটদাদা ঢাকা মেডিকেলের ছাত্র। পাকিস্তানীরা যখন গুলি চালাল তখন একটুর জন্য দাদা রফিক সালাম বরকতদের সারিতে গিয়ে মেশেনি। একাত্তরে ওরা আমার বাবা আর আমার চাচাকে ধরে নিয়ে যায় মেরে ফেলার জন্য। বাবা যদি পাকিস্তানে পড়াশোনার সুবাদে উর্দু বলতে বা বুঝতে না পারতেন আর এফ. কে. চৌধুরী যদি দাদার বন্ধু না হতেন, তাহলে আমার আর পৃথিবীতে আসতে হত না। আমি নিজেও তাদের জ্বালা কম ভোগ করিনি যদিও আমার জন্ম স্বাধীনতার পরে। আবুধাবীতে আমাদের ক্লাসে একটা পাকিস্তানী মেয়ে ছিল, যার বাবাকে মুক্তিযোদ্ধারা ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সেই মেয়ে সুযোগ পেলেই আমার পেছনে লাগত। ভাবখানা এমন যেন আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওর বাবার ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছি।

পাকিস্তানের পাঠানদের খুব ভালো দেখেছি। তাদের আহামরি কোন জ্ঞানবুদ্ধি নেই। কিন্তু আমি আবুধাবীতে প্রায়ই জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতাম রাস্তার আইল্যান্ডে যে খেজুর বাগান, তাতে একজন পাঠান সকালসন্ধ্যা কাজ করতেন। প্রতিদিন আযানের সাথে সাথে উনি জামা বদলে ওযূ করে বাগানেই ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। আমার দেখতে যে কি ভালো লাগত! জুমার রাত এবং জুমার দিন পাঠান ট্যাক্সিচালকরা মুসলমানদের থেকে কোন টাকা-পয়সা নিতেন না। ঈদের দিন খেজুর বাগানে যেসব পাঠান কাজ করতেন তারা বাবাকে ছালাত শেষে বাসায় যাবার পথে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে ভোজ খাইয়েছিল। আর আমার ক্লাসের ঐ বজ্জাত মেয়েটার থেকে আমাকে সারাক্ষণ ছায়ার মত আগলে রাখত বিশালকায় একটা পাঠান মেয়ে। কিন্তু পাঞ্জাবীরা হাড়বজ্জাত। ওরা আমাদের যেমন জ্বালিয়েছে, পাকিস্তানের বাকী অঞ্চলের লোকজনকে ঠিক সেভাবেই জ্বালিয়ে খাচ্ছে। সব মিলে সাধারণভাবে পাকিস্তানীদের আমার খুব একটা পছন্দ না। তাই ওদের সাথে আর যোগাযোগ হয়ে উঠল না।

শীত যাই যাই করছে, এমন সময় একদিন ঐ লোক একবাটি ফিরনী নিয়ে উপস্থিত, সাথে বন্ধুত্বের আহ্বান! ততদিনে স্কুলে আমার মেয়ের সাথে যয়নবের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ওনাদের মিষ্টি আহ্বানে আমি ঝাল ঝাল পাকোড়া দিয়ে সাড়া দিলাম। পরে জানতে পারলাম ওনাদের বাড়ী পাকিস্তানের ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সে *(পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ- পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং খাইবার-পাখতুনওয়া-যাকে ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সও বলা হয়)*। তখন নিজেই লজ্জা পেলাম। ঐ অঞ্চলের লোকজন খুব

সহজ-সরল আর ভালো হয়। যেমন তার কিছুদিন পর আমরা পাড়ার মধ্যেই আরেকটা বাসায় শিফট করলাম। বেচারা, ওনার নাম শাফকাত, বৃষ্টির মধ্যে নিজে মাথায় করে ভারী বিছানা আগের বাসা থেকে নতুন বাসায় এনে আমাদের সাথে ধরাধরি করে সেট করে দিলেন। শিফট করার শেষদিন রান্না করতে কষ্ট হবে দেখে ওনার স্ত্রী হাবীবা আমাদের বাসায় দাওয়াত করে খাওয়ালেন। আমাদের পাড়ায় দুটো বাংলাদেশী পরিবার আছে। তাদের কাছেও আমরা এই সহযোগিতা আশা করিনি। তাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই সাহায্য আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে দিল।

বাসা গোছগাছ হওয়ার পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমরা তাঁদের দাওয়াত দিলাম। আমার জানা ছিল না যে ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সের লোকজন ঝাল খায়না। ঝাল কমিয়ে রান্না করার পরও তাঁদের মুখ ঝালে লাল হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁরা আচার-আচরণ কথাবার্তায় বুঝতেই দিলেন না যে তাঁদের খেতে কষ্ট হয়েছে। যখন ধারণা করলাম ঘটনা কি, তখন আমি নিজেই লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম। কিন্তু তাদের ভদ্রতায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল, হাবীবা পাড়ার ছেলেমেয়েদের কুরআন পড়া শেখায়। আমাদের বাংলাদেশীদের অধিকাংশই বিদেশে এসে হালাল-হারামের ধার ধারে না, আর ইসলামিক লোকজন আমরা তখনো খুঁজে পাইনি। তাই আমরা খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম যে, কাকে জিজ্ঞেস করলে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটা খাবার কেনার জন্য প্যাকেটের ওপর ইনগ্রেডিয়েন্টস পড়তে পড়তে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। প্রতিবেলা বাসায় রান্না করতে করতে মনে হত এর থেকে বুঝি আর নিস্তার নেই। শাফকাত ভাই আমাদের অনেক মসজিদ, হালাল দোকানপাট চিনিয়ে দিলেন। দেখলাম, ক্যালগেরীতে ভুরি ভুরি মুসলিম দোকানপাট আর হালাল রেস্টুরেন্ট আছে। বিভিন্ন দোকানে যে কাঁচা খাবারের প্যাকেট পাওয়া যায়, তার ওপরেই কোম্পানীর ফোন নাম্বার দেয়া থাকে। ফ্যাক্টরীতে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া যায় এতে শূকরজাত কোন উপাদান বা জেলাটিন আছে কিনা ইত্যাদি। শিখলাম নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলো কোনটা কোন কোম্পানীর কিনলাম সেটা মুখস্ত করে ফেলতে হবে। আর তারপর থেকে সবসময় একই কোম্পানীর কিনতে হবে, নতুবা নতুন ব্রান্ড কিনতে হলে আবার ফ্যাক্টরীতে ফোন করতে হবে। আমাদের যতদিন গাড়ী ছিল না ততদিন উনি আমাদের বাজারে নিয়ে যেতেন আবার বাসার সামনে বাজার নামিয়ে দিয়ে যেতেন নিজের হাতে।

সেবার স্কুল শুরু হওয়ার পর থেকে রাদিয়া তাদের সাথে স্কুলে যেতে শুরু করল। হাবীবা প্রায়ই নানারকম তরকারী নাস্তা বানিয়ে পাঠায়। পরে দেখলাম শুধু আমাদের নয়, পাড়ার যত পরিচিত লোকজন, অসুস্থ রোগী সবাইকে সে নিয়মিত খাবার পাঠায়। কারো অসুবিধা থাকলে তাদের বাচ্চাদের ওদের বাসায় রেখে যায়। আমি নিজেও একবার এক মৃত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার সময় আমার ছেলেমেয়েদের হাবীবার কাছে রেখে গেলাম। তখন রাদিয়া জানাল শাফকাত ভাই বাচ্চাদের জন্য নানারকম খেলনা বানান আর পাড়ার তাবৎ বাচ্চাদের খেলতে দেন। বিশেষ করে ওনার হাতে বানানো প্লেন আর অটোমেটিক স্কিপিং রোপ বাচ্চাদের খুব পছন্দ হল।

কিছুদিনের মধ্যে হাবীবার সাথে আমার এত বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে রান্নার মাঝে লবণ মরিচ পেঁয়াজ শেষ হয়ে গেলে আমি নির্দ্বিধায় ওর বাসা থেকে নিয়ে আসতে শুরু করলাম। বাচ্চাদের খেলনা, রিহামের সেই বিখ্যাত স্ট্রলার আদানপ্রদান হল।

এর কিছুদিন পর আমি একটা কোর্সে ভর্তি হলাম। হাবীবা বারবার অনুরোধ করল রিহামকে ওর কাছে রেখে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমি পারতপক্ষে লোকজনকে কষ্ট দিতে পছন্দ করি না। তাই ওকে ডে-কেয়ারে রাখার ব্যবস্থা করলাম। কোর্সের শেষাংশে দেড়মাস চাকরী ছিল। আমার ভাগ্য ভাল। একটা বড় গ্যাস কোম্পানীতে চাকরী পেলাম। যেতে হতো সকাল সাতটায় যেখানে সূর্যোদয় হয় সকাল নটায়। বাচ্চাদের ঘুমে দেখে যেতাম। বাড়ী ফিরতাম সন্ধ্যা পাঁচটায় অথচ সূর্যাস্ত হতো সাড়ে চারটায়। চাকরীটা ভালই ছিল। ছালাতের ব্যাপারে কোন অসুবিধা ছিল না। আমাদের বাসা রেলস্টেশন থেকে দুই মিনিটের হাঁটাপথ। তাই মাইনাস ৪০ ডিগ্রীতেও যাওয়া-আসাতে খুব একটা কষ্ট হত না। ডাউনটাউনের সব বিল্ডিং কাঁচের টানেল দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। তাই বাইরে যখন মাইনাস ৪০ তখন লোকজন টানেলে +১৫ ডিগ্রীতে চলাফেরা করতে পারে। যে কারণে এই টানেলগুলোর নামই প্লাস ফিফটিন। কিন্তু দেখা গেল কাজ করে এসে, ঘর গুছিয়ে, রান্না করে বাচ্চাদের কিছুতেই সময় দিতে পারছি না। তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম দেড়মাস পূর্ণ হয়ে গেলে আর চাকরীর নামও নেব না।

আমাদের পাঁচটা-ছটার মধ্যে খেয়ে ফেলার অভ্যাস। দেখা গেল পাঁচটায় এসে ছটার ভেতর রান্না করে বাচ্চাদের খাইয়ে সব গুছিয়ে দশটার মধ্যে শুতে গিয়ে কিছুতেই আর কুলিয়ে উঠতে পারিনা। আমার বাচ্চাদের কখনো বাইরের খাবার, ফাস্টফুড বা প্যাকেটজাত খাবারের অভ্যাস করাইনি। তাই টেনশনটা ছিল বেশী। এসময় হাবীবা প্রতি সপ্তাহে নিজে থেকেই দু'তিনবার করে খাবার পাঠাতে শুরু করল। একদিন শরীর খারাপ ছিল। সাধারণত আমি আর কিছু না হোক ভাত রান্না করে যেতাম, যেন সাড়ে তিনটায় আমার মেয়ে যখন আসে, তখন অন্ততঃ ডিম ভেজে হলেও যেন খেয়ে নিতে পারে। সেদিন ভাতও রান্না করা হয়নি। অফিসে কিছুতেই কাজে মন দিতে পারছি না। চারটা বাজতেই ছুটলাম রেলস্টেশনের দিকে। মনে মনে ভাবছি আমার ছেলেমেয়েগুলো না খেয়ে নিশ্চয়ই শুকনো মুখে বসে আছে। যাব, রান্না করব, তারপর ওরা খাবে, কত দেরী হয়ে যাবে! আমার মেয়েটা আবার ক্ষুধা সহ্য করতে পারেনা। এত কষ্ট লাগছিল আমার বাচ্চাদের জন্য যে নিজেকে অপদার্থ মা হিসাবে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। সেদিন বরফ পড়ে রেললাইন স্লিপারী হয়ে গিয়েছে, সব চলছে ধীরগতিতে আর আমার হার্টবিট বেড়ে চলেছে প্রতি সেকেন্ডে। স্টেশনে যখন নেমেছি তখনই অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে, আমি বাসায় উড়ে চলে যাই।

বাসার দরজায় এসে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। মুখের চামড়া টেনশনে চড়চড় করছে। ছালাত আগে পড়ব না, ভাত আগে বসাব? চাবি দিয়ে দরজা খুলে দেখি আমার ছেলেমেয়ে কিচেনের ডাইনিং টেবিলে বসে মহা উৎসাহে কথাবার্তা বলছে। ভীষণ অপরাধবোধ হল যে বেচারারা নিশ্চয়ই উল্লসিত যে মা এসেছে, এবার রান্না হবে, খাওয়া দাওয়া হবে! তাকিয়ে দেখি ওরা অলরেডি খাচ্ছে। হাঁফ ছেড়ে ভাবলাম, হাফিজ সাহেবকে আল্লাহ রহমত করুন! আমি বাসায় থাকলে উনি প্রায়ই রান্না করেন, কিন্তু না থাকলে কেন যে করেননা আল্লাহই জানেন! শেষ পর্যন্ত আল্লাহ ওনাকে হেদায়েত করেছেন। রাদিয়াকে বললাম, 'কি খাচ্ছ আম্মু?' ও মহা আনন্দে বলল, 'বিরিয়ানী'। হাফিয ছাহেব তো বিরিয়ানী রান্না করতে পারেন না! 'তোমরা বিরিয়ানী পেলে কোথায়?' 'হাবীবা আন্টি পাঠিয়েছে'–বলেই আবার খাওয়া-দাওয়ায় মনোনিবেশ করল দুই ভাই-বোন। কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে এলো। আল্লাহ তোমাকে ধন্যবাদ এই পাকিস্তানীদের জন্য।

কবিতা

আযান

কা জী ন জ রু ল ই স লা ম

অকাজের সে-কাজের মাঝে ডুবে যখন থাকি,
ভাবি না ক' কি যে ছিলুম,আবার হবই বা কি।
শুধু মোহ চোখের কালো মায়ারই জাল বুনে,
কাঁচা বুকের 'খুন' পিয়ে নেয় বিষাক্ত কাম-ঘুণে।
বুঝেও বুঝি না ক' এ যে এক এক পা করে
পলে পলে গোরের দিকেই যাচ্ছি ক্রমে সরে।
শুনি তখন আজানের কি বজ্র-গভীর স্বর–
'আল্লাহু আকবর'–'আল্লাহু আকবর' !
বুঝি আর সে নাই-বা বুঝি,তবু প্রাণের মাঝে
চঞ্চল সে গুম্‌রে মরে কী আকুলতা যে !
অবুঝ হিয়ায় উদাস-করা কি জানে এ ডাক,
প্রাণের মাঝে ফাঁকা বেদনা খায় শুধু ঘুরপাক !
কি সে বেদন প্রাণই জানে,কইতে কিছু নারি ,–
তবু বিয়োগ-ব্যথায় কিসের মন হয় হায় ভারী !
ছেড়ে যেতে হবে রে হায় এ-বিশ্ব সুন্দর,
'আল্লাহু আকবর' ঐ শোন –'আল্লাহু আকবর !'

ওগো পাগল-উদাস-করা পবিত্র আহ্বান,
কেমন করে ভক্তি-ক্ষীরে ডুবিয়ে দাও জান্ !
বক্ষে কিসে পাগল-ঝোরার উজান বয়ে যায়,
ভোর-বেলাকার আবছায়া আর সাঁঝের ম্লানিমায় ;
দুপুর বেলার রোদ আর বৈকালের পূরবীয়
রাতের ডাকে ছড়াও বিশ্ব কতই সুরভিই !
মাটির মানুষ প্রভুর কাজে পাছে করি হেলা,
তাইতে তুমি ডেকে ডেকে জাগাও পাঁচাই বেলা।
তোমার ডাকে একটি বেলা না দিলে সে সায়,
বক্ষ বিঁধে অনুতাপের তীক্ষ্ণ ছুরিকায় !
তুমি আছ 'ইসলাম' তাই তেমনি আজো জেগে,
ডুবে নিক অবহেলার ঘোর ঝাপটা লেগে।
ওগো পূত! ওগো গভীর !ওগো উদাস ডাক !
ওগো আজান! তোমার বিষাণ বিশ্বে বেজে যাক–
যতদিন না ইসরাফিলের প্রলয়-বিষাণ বাজে,
এম্‌নি করে ব্যাকুল স্বরে দিন-দুনিয়ার মাঝে।

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্র সংবাদ

২০১১-২০১৩ সেশন

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন

রাজশাহী ১৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় নওদাপাড়া রাজশাহীতে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দালন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সম্মেলনে 'যুবসংঘ'-এর ২০১১-২০১৩ সেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। নব মনোনীত কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল-

ক্রমিক	নাম	পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	যেলা
১	মুযাফফর বিন মুহসিন	সভাপতি	এম.এ (এম.ফিল গবেষক)	রাজশাহী
২	নূরুল ইসলাম	সহ-সভাপতি	এম.এ (এম.ফিল গবেষক)	রাজশাহী
৩	আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব	সাধারণ সম্পাদক	এম.এ (এম.ফিল গবেষক)	সাতক্ষীরা
৪	আব্দুর রশীদ আখতার	সাংগঠনিক সম্পাদক	কামিল	কুষ্টিয়া
৫	আরীফুল ইসলাম	অর্থ সম্পাদক	এম.এ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
৬	আব্দুর রকিব	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	এম.এ (শেষ বর্ষ)	সাতক্ষীরা
৭	আব্দুল হালীম	তাবলীগ সম্পাদক	এম.এ	রাজশাহী
৮	হারূনুর রশীদ	সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক	বি.এ (অনার্স ৩য় বর্ষ)	ঝিনাইদহ
৯	আব্দুর রাকীব	দফতর সম্পাদক	বি.এ (অনার্স ২য় বর্ষ)	সাতক্ষীরা

দায়িত্ব হস্তান্তর বৈঠক

রাজশাহী ১৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : ২০১১-২০১৩ সেশনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠনের পর অদ্য বিকাল ৪ টায় পূর্বতন দায়িত্বশীলদের নিকট থেকে নবনির্বাচিত কমিটির দায়িত্বগ্রহণ উপলক্ষে বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। নবনির্বাচিত সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে উক্ত বৈঠকে বক্তব্য রাখেন সদ্য বিদায়ী সভাপতি ড. কাবীরুল ইসলাম। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ এ দেশের বুকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক সমাজবিপ্লবের মহান লক্ষ্য নিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নবনির্বাচিত কমিটিকে যোগ্য কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করে যেতে হবে। তিনি নবনির্বাচিত কমিটিকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান এবং এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। বৈঠকে আরো বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সহ-সভাপতি আকবার হোসাইন এবং অর্থ-সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। নবনির্বাচিত সভাপতি তাঁর বক্তব্যে সাবেক সভাপতি ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং আগামী দিনের পথ চলায় তাদের আন্তরিক সহযোগিতার পাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরিশেষে হাদিয়া বিনিময়ের মাধ্যমে বৈঠক সমাপ্ত হয়।

কেন্দ্রীয় সভাপতির দুবাই গমন

১৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিবাগত রাত ৯টায় মুম্বাইভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল পীস টিভি বাংলা'র আমন্ত্রণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন এমিরেট্সের একটি ফ্লাইটযোগে দুবাই গমন করেন। উল্লেখ্য, পীস টিভি গত বছর বাংলা বিভাগ চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেখানে একজন আলোচক হিসাবে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতিকে আমন্ত্রণ জানায়। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'-এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ এবং ঢাকা যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি জনাব আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলও তার সফরসঙ্গী হন। দীর্ঘ এক মাস যাবৎ পীস টিভি বাংলায় টিভি টক/গ্রুপ ডিসকাশন প্রভৃতি ক্যাটাগরীতে তাদের আলোচনা ধারণ করা হয়। অনুষ্ঠানের ফাঁকে দুবাই এবং আবুধাবীতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আয়োজিত কয়েকটি যুবসমাবেশেও কেন্দ্রীয় সভাপতি বক্তব্য রাখেন এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। অতঃপর ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সভাপতি ও তার সফরসঙ্গীরা ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদেরকে স্বাগত জানান 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রকিব, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, ঢাকা যেলা আন্দোলনের অর্থ সম্পাদক হারুণ হোসাইন, ঢাকা যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক ফযলুর রহমান এবং ঢাকা যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

যেলা সংবাদ

কমিটি গঠন : ২০১১-২০১৩ সেশন

ঝিনাইদহ : গত ১৭ই মার্চ যুবসংঘ ঝিনাইদহ যেলা কমিটি গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম এবং সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হারূনুর রশীদ। পরিশেষে মিলন আখতারকে সভাপতি এবং মনীরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নীলফামারী : গত ১৯শে মার্চ যুবসংঘ নীলফামারী যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ সময় নীলফামারী যেলা কার্যালয়ে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম এবং সাবেক সভাপতি ড. এ.এস. এম আযীযুল্লাহ। পরিশেষে মুহাম্মাদ আব্দুজ জলীলকে সভাপতি এবং আব্দুস সালামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

জামালপুর : গত ২৪শে মার্চ যুবসংঘ জামালপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ সময় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ কিবরিয়া। সংক্ষিপ্ত আলোচনা বৈঠকের পর আব্দুস সবুরকে সভাপতি এবং জাকির হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

রাজবাড়ী : গত ২৪শে মার্চ যুবসংঘ রাজবাড়ী যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। পরিশেষে বেলাল হুসাইনকে আহ্বায়ক এবং মুহাম্মাদ ঈমান আলীকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

কুমিল্লা : গত ২৫শে মার্চ যুবসংঘ কুমিল্লা যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। পরিশেষে জামীলুর রহমানকে সভাপতি এবং মোহাম্মাদ ইউনুসকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

গাযীপুর : গত ২৯শে মার্চ যুবসংঘ গাযীপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রকিব। পরিশেষে হাতেম বিন পারভেজকে সভাপতি এবং আমীর হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সাতক্ষীরা : গত ৬ই এপ্রিল যুবসংঘ সাতক্ষীরা যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন ও সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। পরিশেষে সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি এবং আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া : গত ৯ই এপ্রিল যুবসংঘ ই.বি, কুষ্টিয়া কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ই.বি. কেন্দ্রীয় মসজিদে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। পরিশেষে আখতারুজ্জামানকে সভাপতি এবং আবু ছালেহকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ই.বি. কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

বগুড়া : গত ১২ই এপ্রিল যুবসংঘ বগুড়া যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। পরিশেষে আব্দুস সালামকে সভাপতি এবং আবুবকর ছিদ্দীককে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নওগাঁ : গত ১৪ই এপ্রিল যুবসংঘ নওগাঁ যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হারূনুর রশীদ ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ। পরিশেষে আফযাল হুসাইনকে সভাপতি এবং আব্দুল আলীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কুষ্টিয়া পশ্চিম : গত ১৩ই এপ্রিল যুবসংঘ কুষ্টিয়া পশ্চিম যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। পরিশেষে মুহসিন আলীকে সভাপতি এবং হাফিযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

রাজশাহী উত্তর : গত ১৫ই এপ্রিল যুবসংঘ রাজশাহী উত্তর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে মৌগাছি বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম ও সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। পরিশেষে আফাযউদ্দীনকে সভাপতি এবং মুস্তাকীম আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ উত্তর : গত ১৭ই এপ্রিল যুবসংঘ চাঁপাইনবাবগঞ্জ দক্ষিণ যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। পরিশেষে মুখতার হোসাইনকে সভাপতি এবং হাফেয আব্দুল বারীকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ঢাকা : গত ২২শে এপ্রিল যুবসংঘ ঢাকা যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রকিব। পরিশেষে ছফিউল্লাহ খানকে সভাপতি এবং হুমায়ন কবীরকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

দিনাজপুর পূর্ব : গত ২৭শে এপ্রিল যুবসংঘ দিনাজপুর পূর্ব যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার এবং কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হারূনুর রশীদ। পরিশেষে রমজান আলীকে সভাপতি এবং আবেদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সিরাজগঞ্জ : গত ২৯শে এপ্রিল যুবসংঘ সিরাজগঞ্জ যেলা পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। পরিশেষে শরীফুল ইসলামকে সভাপতি এবং রবীউল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

জয়পুরহাট : গত ২৯শে এপ্রিল যুবসংঘ জয়পুরহাট যেলা পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। পরিশেষে আমিনুল ইসলামকে সভাপতি এবং আবুল কালাম আযাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নরসিংদী : গত ২৯শে এপ্রিল যুবসংঘ নরসিংদী যেলা পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রকিব। পরিশেষে আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে সভাপতি এবং আব্দুস সাত্তারকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

রংপুর : গত ৫ই মে যুবসংঘ রংপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুর রাকীব ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বজলুর রহমান। পরিশেষে আব্দুল ওয়ারেছকে সভাপতি এবং আশিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

দিনাজপুর পশ্চিম : গত ৮ই মে যুবসংঘ দিনাজপুর পশ্চিম যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। পরিশেষে আনিসুর রহমানকে সভাপতি এবং সাদীকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মেহেরপুর : গত ৮ই মে যুবসংঘ মেহেরপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। পরিশেষে মনিরুল ইসলামকে সভাপতি এবং আবুল বাশারকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

পাবনা : গত ১০ই মে যুবসংঘ পাবনা যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম। পরিশেষে তারিক হাসানকে সভাপতি এবং আনীসুর রহমান মারূফকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

রাজশাহী দক্ষিণ : গত ১১ই মে যুবসংঘ রাজশাহী দক্ষিণ যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে চারঘাট, হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত এক যুবসমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম। পরিশেষে মুনীর হোসাইনকে সভাপতি এবং মামুনুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

শাখা সংবাদ

বানাইপুর, বাগমারা, রাজশাহী : গত ১৪ই এপ্রিল বানাইপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর শাখা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম। যেলা আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাষ্টার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকা যুবসংঘ-এর তাবলীগ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন, দফতর সম্পাদক আব্দুল মান্নান, মজপাড়া শাখা 'আন্দোলনে'র সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আযহারুল ইসলাম প্রমুখ। পরিশেষে মামুনুর রশীদকে সভাপতি ও আব্দুর রায্যাককে সেক্রেটারী করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী : গত ৫ই মে হাটগাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী উত্তরের সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম ও সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ এবং রাজশাহী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা আন্দোলনে'র সাংগঠনিক সম্পাদক মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম, হাটমাধবপুর আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আহমাদ আলী, শাখা যুবসংঘ দায়িত্বশীল সুলতান মাহমূদ ও আব্দুল মান্নান প্রমুখ। পরিশেষে আব্দুল হালীমকে সভাপতি ও আরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে হাটগাঙ্গোপাড়া বাজার শাখা গঠিত হয়।

ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যু (!)

কথিত আল-কায়েদা প্রধান এবং পশ্চিমা বিশ্বের ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ তত্ত্বের দাবার ঘুটি হিসাবে ব্যাবহৃত বহুল আলোচিত ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানের এ্যাবোটাবাদে এক মার্কিন সেনা হামলায় নিহত হয়েছেন। সারাবিশ্বে এ বিষয়ে ব্যাপক ধূম্রজাল থাকলেও মার্কিন সূত্রগুলো থেকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। জানা গেছে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে মাত্র ৯০ কি.মি. দূরের এক সেনাশহর এ্যাবোটাবাদের এক কাঁটাধারে ঘেরা দ্বিতল বাড়িতে গত ৬ বছর ধরে আত্মগোপন করে বসবাস করছিলেন আমেরিকার ‘মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী’ ওসামা বিন লাদেন। মার্কিন সূত্র মতে, গত বছর আগস্ট মাসে গোপন সূত্রে এই বাড়িটি শনাক্ত করে সিআইএ’র গোয়েন্দারা। তখন থেকে তারা বাড়িটির দিকে নজর রাখছিল। অতঃপর সুনিশ্চিত গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার পর ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সবুজ সংকেত পায়। অতঃপর ১ মে দিবাগত রাত সাড়ে দশটায় আফগানিস্তান থেকে গোপনে পাকিস্তানী রাডারকে ফাঁকি দিয়ে দু’টি হেলিকপ্টার নিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে মার্কিন নেভির একটি কমাণ্ডো দল। তারা ঐ বাড়িতে হামলা চালায়। অল্পসময়ের মধ্যে তারা বাড়িটি দখলে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ওসামা বিন লাদেনকে নিরস্ত্র অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। এরপর তারা ওসামা বিন লাদেনের লাশ তাদের হেলিকপ্টারে করে আফগানিস্তানে তাদের সেনাঘাটিতে নিয়ে যায়। অতঃপর ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাকে আরব সাগরে মোতায়েন একটি সেনা জাহাজে স্থানান্তর করা হয় এবং সেখান থেকে তার লাশ আরব সাগরের বুকে নিমজ্জিত করা হয়।

এদিকে তার নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে জল্পনা-কল্পনা, আলোচনা-সমালোচনার ঝড় শুরু হয়। মার্কিনী ও ইউরোপীয় সমাজ দৃষ্টিকটুভাবে উল্লাসে মেতে উঠে। অপরদিকে মুসলিম দেশসমূহে সাধারণ জনগণ পক্ষে-বিপক্ষে না গিয়ে অনেকটা নীরবতা পালন করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওসামা নিহত হওয়ার ঘটনাকে ‘ন্যায়বিচার’ বলে আখ্যায়িত করেন। ওআইসি কিছুটা শীতল দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেছে যে, ওসামা বিন লাদেনের কারণে বহু নিরপরাধ মানুষ প্রাণহানির শিকার হয়েছে। আর সন্ত্রাসীদের জন্য ন্যায়বিচার প্রয়োজন ঠিকই, তবে অবশ্যই সন্ত্রাসের পিছনে যে কারণগুলো কাজ করেছে তা অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ওসামা বিন লাদেন ১৯৫৭ সালে এক ধনাঢ্য সঊদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আফগানিস্তানে গমন করেন। এ সময় আমেরিকা আফগান মুজাহিদদেরকে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি সহযোগিতা করে। ১৯৮৮ সালে তিনি আল-কায়েদা বাহিনী গঠন করেন বলে কথিত রয়েছে। ১৯৯০ সালে ওসামা বিন লাদেন সোভিয়েত বিজেতা বীর বেশে সঊদী আরবে ফিরে আসেন। ১৯৯০ সালে সাদ্দাম হোসেন কুয়েতে আক্রমণ করলে সঊদী বাদশাহ কিং ফাহাদ আত্মরক্ষার্থে আমেরিকান সেনাবাহিনীর সাহায্য কামনা করেন। এ সময় ওসামা বিন লাদেন সঊদী বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ করে বিধর্মীদের সাহায্য না নেওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু এ অনুরোধ উপেক্ষা করে আমেরিকানদের আমন্ত্রণ জানালে তিনি সর্বপ্রথম সঊদী সরকারের বিরুদ্ধে জনসম্মুখে কথা বলেন। ফলে ১৯৯২ সালে সঊদী সরকার তাকে বহিষ্কার করে এবং তিনি সূদানে নির্বাসনে যান। তারপরও তিনি সঊদী সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা অব্যাহত রাখলে ১৯৯৪ সালে তার সঊদী নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালে তিনি সুদান থেকে আফগানিস্তানের জালালাবাদে ফিরে আসেন। তিনি তালিবান নেতা মোল্লা ওমরের সাথে জোট বাঁধেন। তারপর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মের জন্য আমেরিকা তাকে দায়ী করতে থাকে। ২০১১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় আমেরিকা ১ম দিনই তাকে দায়ী করে এবং তাকে কেন্দ্র করেই আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে তালিবান শাসনের অবসান ঘটায়, সারাদেশ তছনছ করে দেয়। তখন থেকেই ওসামা বিন লাদেনকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছিল, তিনি মার্কিন হামলায় নিহত হয়েছেন। অবশেষে ২০১১ সালের ১লা মে দিবাগত রাতে পাকিস্তানের এ্যাবোটাবাদে তার মৃত্যু ঘটেছে বলে মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানায়। এভাবে মিডিয়ার কল্যাণে ৫৪ বছর বয়স্ক ও বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত ব্যক্তিত্ব ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে রহস্যের আপত অবসান ঘটে। যদিও রহস্যের এখনো অনেক বাকি রয়েছে। গত ৯ই মে ইরান জানিয়েছে বিন লাদেন ইতিপূর্বেই রোগগ্রস্ত হয়ে মারা যান। তাদের মতে, সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য ওবামা এই নাটক সাজিয়েছেন। ওসামা বিন লাদেনের মৃতদেহের ছবি প্রকাশ না করা, পানিতে ডুবিয়ে দেয়া ইত্যাদি এ প্রশ্নকে আরো ঘনীভূত করেছে।

ফ্রান্সে জনসম্মুখে নিকাব পরিধান নিষিদ্ধ

ইউরোপের সর্ববৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যার দেশ (৬০ লক্ষ) ফ্রান্স সরকার গত ১১ এপ্রিল থেকে হিজাব/নিকাব পরে জনসম্মুখে চলাচল নিষিদ্ধ করেছে। যদি কোন মহিলা পাবলিক প্লেসে নিকাব পরিধান করে, তার জন্য ১৫০ ইউরো জরিমানা করা হবে এবং তাকে নাগরিকত্ব শেখার জন্য একটি কোর্স করতে হবে। আর যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নিকাব পরিধানে বাধ্য করে, তবে স্বামীর ২৫,০০০ ইউরো জরিমানা এবং সর্বোচ্চ ২ বছর সাজার বিধান রাখা হয়েছে। ফ্রান্সে নিকাব পরিধানকারীর সংখ্যা ২০০০ বা তার কিছু বেশী বলে সে দেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ফ্রান্সে হিজাব নিয়ে বিতর্কের আরম্ভ ১৯৮৯ সাল থেকে। যখন একটি স্কুলে ৩ জন মুসলিম ছাত্রী শিক্ষকের নির্দেশ সত্ত্বেও মাথার স্কার্ফ খুলতে আপত্তি জানায়। এরূপ বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটার পর ১৯৯৪ সালে ফ্রান্সের স্কুলগুলোতে বিশেষ ধর্মীয় চিহ্নবাহী উপাদান যেমন হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদেও জন্য রাস্তায় নামে স্কুল ছাত্রীরা। অতঃপর ১৯৯৪ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০০ ছাত্রীকে হিজাব পরিধানের জন্য অভিযুক্ত অথবা স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। ২০০৪ সালে একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে, ৮০৬ জন শিক্ষার্থী এই আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের মধ্যে ৫৩৩ জন বাধ্য হয়ে হিজাব ছাড়াই ক্লাসে উপস্থিত হয়েছে এবং ৭৩ স্কুল থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। আর কতজন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে তার পরিসংখ্যান জানা যায়নি। ২০১০ সালের ১৩ জুলাই ফ্রান্স সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরেও জনসম্মুখে বোরকা ও নেকাব পরিধানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞা ছিল নেকাব তথা মুখ ঢেকে চলার বিরুদ্ধে। ২০১১ সালে এপ্রিল মাসে এই আইন চূড়ান্তভাবে কার্যকর করা হয়। এর বিরুদ্ধে ফ্রান্সসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং একে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

Contents

সাধারণ জ্ঞান

পবিত্র কুরআন নাযিলের ক্রমধারা

পবিত্র কুরআন প্রথম দফায় নাযিল হয়েছিল লওহে মাহফূযে। অতঃপর সেখান থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর নবুওতের দীর্ঘ ২৩ বছরে বিভিন্ন ঘটনা ও সমস্যার প্রেক্ষিতে থেমে থেমে নাযিল হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে নির্দেশনা আকারে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সূরা সমূহ নাযিল হয়েছে। প্রথম যে আয়াত নাযিল হয়েছিল তা মুফাসসিরদের ঐক্যমতে সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচ আয়াত এবং সর্বশেষ আয়াত অধিকাংশের মতে সূরা বাক্বারার ২৮১ নং আয়াত– وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُــــوْنَ পবিত্র কুরআনের মাছহাফে সূরাগুলির বর্তমান যে ধারাক্রম; তা মূলত কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সাজানো হয়নি, বরং অধিকাংশ ওলামাদের মতে, তা জিবরাঈল (আঃ) কর্তৃক অহী প্রাপ্ত হয়ে রাসূল (ছাঃ) সাজিয়েছিলেন *(মান্না আল-কাত্তান, মাবাহিছ ফি উলূমিল কুরআন, পৃ: ১৩৭-১৩৮)*। এ ধারাটি ২৩ বছর ধরে বিচ্ছিন্নভাবে নাযিলকৃত কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহকে যেমন সুবিন্যস্ত করেছে, তেমনি কুরআনের বিষয়বস্তু ও আলোচনার ধারাবাহিকতাকে চমৎকারভাবে সুরক্ষা করেছে।

তবে কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতা জানারও বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে। এজন্য তাফসীর গ্রন্থসমূহে কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতা তথা কোন সূরার পর কোন সূরা নাযিল হয়েছে সে ইতিহাস পাওয়া যায়। মক্কায় এবং মদীনায় অহী নাযিলের ধরন-প্রকৃতি কেমন ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতায় দ্বীনী বিধি-বিধানের প্রয়োগের যথার্থতা কি?– এ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এ বিষয়ক জ্ঞান খুব কাজে আসবে। তাই সাধারণ পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নিম্নে এই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সূরাসমূহের ধারাক্রম উল্লেখ করা হল। যদিও এমনও সূরা রয়েছে যার কিছু অংশ মক্কায় এবং কিছু অংশ মদীনায় নাযিল হয়েছে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মতভেদও রয়েছে। তদুপরি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতসমূহের উপর নির্ভর করে প্রস্তুতকৃত তালিকাটি নিম্নে প্রদত্ত হল–

মক্কায় নাযিলকৃত ধারাবাহিক সূরা সমূহ :

নাযিলের ক্রম	সূরার নাম	মোট আয়াত	বর্তমান ক্রম
১	আল আলাক্ব	১৯	৯৬
২	আল ক্বালাম	৫২ (১৭-৩৩, ৪৮-৫০ নং ব্যতীত)	৬৮
৩	আল মুযযাম্মিল	২০ (১০-১১,২০ নং ব্যতীত)	৭৩
৪	আল মুদ্দাছ্ছির	৫৬	৭৪
৫	আল ফাতিহা	৭ (মক্কায় ও মদীনায় দু'বার নাযিল হয়)	১
৬	আল মাসাদ	৫	১১১
৭	আত তাকভীর	২৯	৮১
৮	আল আ'লা	১৯	৮৭
৯	আল লাইল	২১	৯২
১০	আল ফাজর	৩০	৮৯
১১	আয্ যুহা	১১	৯৩
১২	আল ইনশিরাহ	৮	৯৪
১৩	আল আছর	৩	১০৩
১৪	আল আদিয়াত	১১	১০০
১৫	আল কাউছার	৩	১০৮
১৬	আত তাকাছুর	৮	১০২
১৭	আল মাঊন	৭ (১-৩ নং ব্যতীত)	১০৭
১৮	আল কাফেরূন	৬	১০৯
১৯	আল ফীল	৫	১০৫
২০	আল ফালাক্ব	৫	১১৩
২১	আন নাস	৬	১১৪
২২	আল ইখলাছ	৪	১১২
২৩	আন নাজম	৬২ (৩২ নং ব্যতীত)	৫৩
২৪	আবাসা	৪২	৮০
২৫	আল ক্বাদর	৫	৯৭
২৬	আশ শামস	১৫	৯১
২৭	আল বুরূজ	২২	৮৫
২৮	আত ত্বীন	৮	৯৫
২৯	কুরাইশ	৪	১০৬
৩০	আল ক্বারিয়া	১১	১০১
৩১	আল ক্বিয়ামাহ	৪০	৭৫
৩২	আল হুমাযাহ	৯	১০৪
৩৩	আল মুরসালাত	৫০ (৪৮ নং ব্যতীত)	৭৭
৩৪	ক্বাফ	৪৫ (৩৮ নং ব্যতীত)	৫০
৩৫	আল বালাদ	২০	৯০
৩৬	আত ত্বারেক্ব	১৭	৮৬
৩৭	আল ক্বামার	৫৫ (৪৪-৪৬ নং ব্যতীত)	৫৪
৩৮	ছোয়াদ	৮৮	৩৮
৩৯	আল আ'রাফ	২০৬ (১৬৩-১৭০ নং ব্যতীত)	৭
৪০	আল জ্বীন	২৮	৭২
৪১	ইয়াসিন	৮৩ (৪৫ নং ব্যতীত)	৩৬
৪২	আল ফুরক্বান	৭৭ (৬৮-৭০ নং ব্যতীত)	২৫
৪৩	ফাত্বির	৪৫	৩৫
৪৪	মারয়াম	৯৮ (৫৮,৭১ নং ব্যতীত)	১৯
৪৫	ত্বহা	১৩৫ (১৩০-১৩১ নং ব্যতীত)	২০
৪৬	আল ওয়াক্বিয়া	৯৬ (৮১-৮২ নং ব্যতীত)	৫৬
৪৭	আশ শু'আরা	২২৬ (১৯৭, ২২৪-২২৬ নং ব্যতীত)	২৬

নাযিলের ক্রম	সূরার নাম	মোট আয়াত	বর্তমান ক্রম
৪৮	আন নামল	৯৩	২৭
৪৯	আল ক্বাছাছ	৮৮ (৫২-৫৫,৮৫ নং ব্যতীত)	২৮
৫০	আল ইসরা	১১১ (২৬,৩২-৩৩,৫৭,৭৩-৮০ নং ব্যতীত)	১৭
৫১	ইউনুস	১০৯ (৪০,৯৪-৯৬ নং ব্যতীত)	১০
৫২	হূদ	১২৩ (১২,১৭,১১৪ নং ব্যতীত)	১১
৫৩	ইউসুফ	১১১ (১-৩,৭ নং ব্যতীত)	১২
৫৪	আল হিজ্‌র	৯৯ (৮৭ নং ব্যতীত)	১৫
৫৫	আল আন‘আম	১৬৫ (২০-২৩,৯১,৯৩,১১৪,১৫১-১৫৩ নং ব্যতীত)	৬
৫৬	আছ ছাফ্‌ফাত	১৮২	৩৭
৫৭	লুক্বমান	৩৪ (২৭-২৯ নং ব্যতীত)	৩১
৫৮	ছাবা	৫৪	৩৪
৫৯	আয যুমার	৭৫	৩৯
৬০	আল গাফির/ আল মু’মিন	৮৫ (৫৬,৫৭ নং ব্যতীত)	৪০
৬১	ফুছ্‌ছিলাত/হা মীম সাজদাহ	৫৪	৪১
৬২	আশ্‌ শু‘আরা	৫৩	৪২
৬৩	আয্‌ যুখরুফ	৮৯	৪৩
৬৪	আদ্‌ দোখান	৫৯	৪৪
৬৫	আল জাছিয়া	৩৭ (১৪ নং ব্যতীত)	৪৫
৬৬	আল আহক্বাফ	৩৫ (১০,১৫,৩৫ নং ব্যতীত)	৪৬
৬৭	আয্‌ যারিয়াত	৬০	৫১
৬৮	আল গাশিয়াহ	২৬	৮৮
৬৯	আল কাহাফ	১১০ (২৮, ৮৩-১০১ নং ব্যতীত)	১৮
৭০	আন্‌ নাহল	১২৮ (১২৬-১২৮ নং ব্যতীত)	১৬
৭১	নূহ	২৮	৭১
৭২	ইবরাহীম	৫২ (২৮-২৯ নং ব্যতীত)	১৪
৭৩	আল আম্বিয়া	১১২	২১
৭৪	আল মু’মিনূন	১১৮	২৩
৭৫	আস্‌ সাজদা	৩০ (১৬-২০ নং ব্যতীত)	৩২
৭৬	আত্‌ তূর	৪৯	৫২
৭৭	আল মুলক	৩০	৬৭
৭৮	আল হাক্কাহ	৫২	৬৯
৭৯	আল মা‘আরিজ	৪৪	৭০
৮০	আন্‌ নাবা	৪০	৭৮
৮১	আন্‌ নাযিয়াত	৪৬	৭৯
৮২	আল ইনফিত্বার	১৯	৮২
৮৩	আল ইনশিক্বাক	২৫	৮৪
৮৪	আর্‌ রূম	৬০ (১৭ নং ব্যতীত)	৩০
৮৫	আল আনকাবূত	৬৯ (১-১১ নং ব্যতীত)	২৯
৮৬	আল মুত্বাফফিফীন	৩৬	৮৩

মদীনায় নাযিলকৃত ধারাবাহিক সূরা সমূহ :

নাযিলের ক্রম	সূরার নাম	মোট আয়াত	বর্তমান ক্রম
৮৭	আল বাক্বারাহ	২৮৬ (২৮১ নং ব্যতীত)	২
৮৮	আল আনফাল	৭৫ (৩০-৩৬ নং ব্যতীত)	৮
৮৯	আলে ইমরান	২০০	৩
৯০	আল আহযাব	৭৩	৩৩
৯১	আল মুমতাহিনা	১৩	৬০
৯২	আন্‌ নিসা	১৭৬	৪
৯৩	যিলযাল	৮	৯৯
৯৪	আল হাদীদ	২৯	৫৭
৯৫	মুহাম্মাদ	৩৮ (১৩ নং ব্যতীত)	৪৭
৯৬	আর রা‘দ	৪৩	১৩
৯৭	আর রহমান	৭৮	৫৫
৯৮	আদ দাহর	৩১	৭৬
৯৯	আত্‌ ত্বালাক	১২	৬৫
১০০	আল বাইয়েনাহ	৮	৯৮
১০১	আল হাশর	২৪	৫৯
১০২	আন নূর	৬৪	২৪
১০৩	আল হাজ্জ	৭৮ (৫২-৫৫ নং ব্যতীত)	২২
১০৪	আল মুনাফিকূন	১১	৬৩
১০৫	আল মুজাদালাহ	২২	৫৮
১০৬	আল হুজুরাত	১৮	৪৯
১০৭	আত্‌ তাহরীম	১২	৬৬
১০৮	আত্‌ তাগাবুন	১৮	৬৪
১০৯	আছ্‌ ছফ	১৪	৬১
১১০	আল জুম‘আ	১১	৬২
১১১	আল ফাত্‌হ	২৯	৪৮
১১২	আল মায়েদাহ	১২০ (৩ ব্যতীত)	৫
১১৩	আত্‌ তাওবাহ	১২৯ (১২৮-১২৯ ব্যতীত)	৯
১১৪	আন্‌ নাছর	৩ (৩ নং আয়াত বিদায় হজ্জে মীনায়)	১১০

- *গ্রন্থনা: আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ

১. প্রশ্ন : ২৫ এপ্রিল ২০১১ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (পূর্বনাম সংস্থাপন মন্ত্রনালয়)-এর ইংরেজি নাম কি?
উত্তর : Ministary of Public Administration.
২. প্রশ্ন : দেশের প্রথম ও একমাত্র মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : চাঁদপুর।
৩. প্রশ্ন : ৩ এপ্রিল ২০১১ কোন যেলায় নতুন বিমানঘাঁটি উদ্বোধন করা হয়?
উত্তর : কক্সবাজার।
৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশে ইলেক্ট্রনিক বুক বা ই-বুকের যাত্রা শুরু হয় কবে?
উত্তর : ২৪ এপ্রিল ২০১১।
৫. প্রশ্ন : স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ১৯৭৪ সালে।
৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রথম টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কি?
উত্তর : বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়।
৭. প্রশ্ন : ১৯৯২ সাল থেকে কোন দেশ বাংলাদেশের একক বৃহত্তম দাতা দেশ?
উত্তর : জাপান।
৮. প্রশ্ন : প্রস্তাবিত নতুন ৪টি সিটি কর্পোরেশন কি কি?
উত্তর : নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, গাযীপুর ও কুমিল্লা।
৯. প্রশ্ন : বাংলাদেশে তৈরী প্রথম যুদ্ধজাহাজের নাম কি?
উত্তর : পেট্রোল ক্রাফট।
১০ প্রশ্ন :. প্রস্তাবিত দেশের বৃহত্তম শিল্প পার্ক কোথায় স্থাপিত হবে?
উত্তর : মিরসরাই, চট্রগ্রাম।
১১. প্রশ্ন : পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ১৫-১৯ মার্চ ২০১১।
১২. প্রশ্ন : সার্কভুক্ত কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি বেশি?
উত্তর : ভারত।
১৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করে কোন ব্যাংক?
উত্তর : ডাচ বাংলা ব্যাংক লি.।
১৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রথম পাঁচ তারকা হোটেল 'শেরাটন'-এর বর্তমান নাম কি?
উত্তর : রূপসী বাংলা।
১৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ 'এমভি জাহান মণি' সোমালীয় জলদস্যুদের কবল থেকে কবে মুক্তি পায়?
উত্তর : ১৪ মার্চ ২০১১।
১৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশে কতটি মোবাইল অপারেটর কার্যক্রম চালু রয়েছে?
উত্তর : ৬ টি।
১৭. প্রশ্ন : বিশ্বের কতটি দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস রয়েছে?
উত্তর : ৪৭ টি।
১৮. প্রশ্ন : বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম কি?
উত্তর : Ministary of Finance.
১৯. প্রশ্ন : বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান কে?
উত্তর : মোঃ মোজাম্মেল হক।
২০. প্রশ্ন : পীস টিভি বাংলা কবে সম্প্রচার শুরু করে?
উত্তর : ২২ এপ্রিল ২০১১।

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক

১. প্রশ্ন : ওসামা বিন লাদেন কবে নিহত হন?
উত্তর : ২রা মে ২০১১।
২. প্রশ্ন : তুরস্কের প্রথম ইসলামপন্থী প্রধানমন্ত্রী কে?
উত্তর : নেকমেতিন এরবাকান।
৩. প্রশ্ন : ১৫ মার্চ ২০১১ কোন দেশ ফিলিস্তীনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়?
উত্তর : উরুগুয়ে।
৪. প্রশ্ন : ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জাপানে।
৫. প্রশ্ন : বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ারের নাম কি?
উত্তর : স্কাই ট্রি (জাপান)।
৬. প্রশ্ন : বর্তমান অস্ত্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : ভারত।
৭. প্রশ্ন : ২০১১ সালের ফরবেসের তথ্য মতে, বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যক্তি কে?
উত্তর : হু জিনতাও (চীন)।
৮. প্রশ্ন : কোন দেশে সামরিক জোট ন্যাটো অভিযান চালাচ্ছে বা উপস্থিত রয়েছে?
উত্তর : আফগানিস্তান ও লিবিয়া।
৯. প্রশ্ন : ১৯ এপ্রিল ২০১১ কোন দেশ দীর্ঘ ৪৮ বছর পর জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে?
উত্তর : সিরিয়া।
১০. প্রশ্ন: ই-বুক এর জনক কে?
উত্তর : মাইকেল এস হার্ট।
১১. প্রশ্ন : সুপার গ্লু-এর উদ্ভাবক কে?
উত্তর : হ্যারি ওয়েসলে কুভার।
১২. প্রশ্ন : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক উন্নতি করেছে কোন দেশ?
উত্তর : সুইডেন।
১৩. প্রশ্ন : ২০১১ মার্চ কোন দেশে ৮.৯ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়?
উত্তর : জাপান।
১৪. প্রশ্ন : বিশ্বে অস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
১৫. প্রশ্ন : লিবিয়ার নেতা মুআম্মার আল-গাদ্দাফীর বাসভবন ও প্রশাসন সদরদপ্তরের নাম কি?
উত্তর : বাব আল-আজিজিয়া।
১৬. প্রশ্ন : ইয়েমেনের রাষ্ট্র পরিচালিত বার্তা সংস্থার নাম কি?
উত্তর : সাবা।
১৭. প্রশ্ন : ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ১২১ কোটি।
১৮. প্রশ্ন : সর্বশেষ বাঘশুমারি অনুযায়ী ভারতে বর্তমান বাঘের সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৭০৬টি।
১৯. প্রশ্ন : সামাজিক যোগাযোগ সাইট 'টুইটার'-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : বিজ স্টোন।
২০. প্রশ্ন : উইকিপিডিয়ার জনক কে?
উত্তর : জিমি ওয়ালেস।

আইকিউ

[কুইজ-১ ও কুইজ-২ এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ২০শে জুনের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। -বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ-১ :

১. পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম আয়াত কোনটি?

ক. সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচ আয়াত, খ. সূরা ফাতিহার ৭ আয়াত, গ. সূরা মুযাম্মিলের ১ম সাত আয়াত, ঘ. সূরা আছরের ৩ আয়াত।

২. ইসলামের প্রথম শহীদ কে ছিলেন?

ক. সুমাইয়া (রাঃ) খ. ইয়াসার আবু আম্মার (রাঃ), গ. খুবায়েব (রাঃ), ঘ. খাব্বাব (রাঃ)।

৩. যাবুর কোন নবীর উপর নাযিল হয়?

ক. সোলাইমান (আঃ), খ. ইবরাহীম (আঃ), গ. যাকারিয়া (আঃ), ঘ. দাউদ (আঃ)।

৪. পবিত্র কুরআনে ইহুদীদেরকে কি বলা হয়েছে?

ক. পথভ্রষ্ট, খ. অভিশপ্ত, গ. মুনাফিক, ঘ. মিথ্যাচারী।

৫. পবিত্র কুরআনে কোন পাহাড়ের কসম করা হয়েছে?

ক. তুর, খ. সিনাই, গ. জাবালুত তারিক, ঘ. ছাওর।

৬. সিন্ধুবিজেতা সেনাপতি কে ছিলেন?

ক. মুহাম্মাদ বিন কাসেম, খ. কুতায়বা বিন মুসলিম, গ. তারিক বিন যিয়াদ, ঘ. আমর বিন আস।

৭. মোঙ্গলীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

ক. হালাকু খাঁ, খ. চেঙ্গিস খাঁ, গ. জহীরুদ্দীন মুহাম্মাদ বাবর, ঘ. তৈমুর লং।

৮. কোন আরব মুসলিম বিজ্ঞানী আবুল কিমিয়া (রসায়নের পিতা) বলা হয়?

ক. আল খাওয়ারযিমী, খ. জাবির বিন হাইয়ান, গ. ইবনে সীনা, ঘ. নাহ্হাস।

৯. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দ্বীপের নাম কি?

১০. তাঞ্জানিয়ার রাজধানীর নাম কি?

কুইজ-২ :

১. ব্রেলভী মতবাদের জন্ম কত সালে?

ক. ১৮৮০ খৃঃ, খ. ১৮৫৬ খৃঃ, গ. ১৮৭৭ খৃঃ, ঘ. ১৯২১ খৃঃ।

২. জামা'আত অর্থ কি?

ক. জনসমষ্টি, খ. আন্দোলন, গ. সংগঠন, ঘ. প্রতিষ্ঠান।

৩. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের জন্ম কত সনে?

ক. ১৯৪ হিঃ, ২৪১ হিঃ, গ. ১৬৪ হিঃ, ঘ. ১৫৬ হিঃ।

৪. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠালাভ করে?

ক. ১৯৬২ খৃঃ, খ. ১৯৬১ খৃঃ, গ. ১৯৬০ খৃঃ, ঘ. ১৯৭১ খৃঃ।

৫. আল খাওয়ারযিমী কে ছিলেন?

ক. বীজগণিতের জনক। খ. রসায়নের জনক। গ. ইতিহাসবিদ। ঘ. চিকিৎসক।

৬. ওসামা বিন লাদেন নিহত হত কত তারিখে?

ক. ১লা মে'১১। খ. ২রা মে'১১। গ. ৬ই মে'১১। ঘ. ৩০ এপ্রিল।

৭. লিবিয়াতে ন্যাটো বাহিনী হামলা শুরু করে কত তারিখে?

ক. ১৫ই ফেব্রু'১১, খ. ২৫শে ফেব্রু'১১, গ. ১৫ই মার্চ'১১, ঘ. ১৯শে মার্চ'১১।

৮. পীস টিভি বাংলার সম্প্রচার শুরু হয় কবে?

ক. ২২শে এপ্রিল'১১, খ. ২৫শে এপ্রিল'১১, গ. ১৫শে এপ্রিল'১১, ঘ. ১৯শে এপ্রিল'১১।

৯. দেশের ৫ম আদম শুমারী শুরু হয় কত তারিখে?

ক. ১৫-১৯শে মার্চ'১১। খ. ২০-২৪শে মার্চ'১১। গ. ১১ই এপ্রিল'১১। ঘ. ১লা মে'১১।

১০. দেশের সর্বশেষ পৌরসভার নাম কি?

ক. কুয়াকাটা। খ. থানচি। গ. রৌমারী। ঘ. সেন্টমার্টিন।

(উত্তরের জন্য বর্তমান সংখ্যাটি দেখুন)

গত সংখ্যার কুইজ (১) -এর সঠিক উত্তর

১. ঘ, ২. ক, ৩. খ, ৪. ক, ৫. খ, ৬. খ ৭. ক ৮. অশ্রু, ৯. টোকিও, ১০. জায়ারে।

গত সংখ্যার কুইজ (২) -এর সঠিক উত্তর

১. ক, ২. ঘ, ৩. ঘ, ৪. গ, ৫. ক, ৬. ক, ৭. ক, ৮. ঘ, ৯. খ, ১০, ক।

শব্দজোট :

{শব্দজোটটি পূরণ করে নাম-ঠিকানাসহ ২০শে জুনের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। এবারের শব্দজটটি তৈরী করেছেন আরব আলী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাবি}

১						২	৩
		৪					
৬			৭	৮			৯
			১০				
		১১			১২		
১৩		১৪					১৫
১৬						১৭	

পাশাপাশি

১. ধর্ম ২. ধ্বনি, শব্দ ৪. নড়াচড়া, কম্পন ৭. বৃত্ত পরিধির অংশ, ১০. রজনী, ১৪. একটি আদর্শ জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন, ১৬. জনক, বাপ, ১৭. স্বভাব, রীতি।

উপর-নীচ

১. চতুর্দিকে জলবেষ্টিত স্থল ৩. পুস্তক ৪. একটি মৌসুমী ফল ৫. তটিনী ৬. ইয়েমেনের একটি বার্তা সংস্থা ৭. ক্ষুদ্রবৃক্ষ ৮. পত্রবিশিষ্ট, ৯. মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ১১. আহ্বান,ডাকা, ১২. হাত, হস্ত, ১৩. একটি ইসলামী পোশাক, ১৫. কাজ, যা করা যায়।

গত সংখ্যার শব্দজোট বিজয়ী ৩ জন

প্রথম: সাঈদ হাসান

কাটিয়া, সরকারপাড়া, সাতক্ষীরা।

দ্বিতীয়: ফয়সাল আহমাদ

মোহনপুর বাজার, মোহনপুর, রাজশাহী।

তৃতীয়: হাবীবুর রহমান

মুজগুন্নী, মণিরামপুর, যশোর।

গত সংখ্যার শব্দজট-এর সঠিক উত্তর

পাশাপাশি : ১. দাউদ ২. সাঈর ৩. ইমরান ৭. তিববত ৯. মর্যাদা ১০. সম্ভ্রান্ত।

উপর-নীচ :

১. দাজ্জাল ৩. রজব ৪. ইমামতি ৫. নবুঅত ৬. কলম ৮. সীমান্ত।